য়ুরোপের শিল্প-কথা

স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার
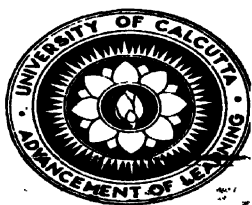
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৪০

উৎসর্গ

যাঁর সঙ্গে একত্র উরোপ ভ্রমণ ক'রে প্রত্যক্ষভাবে

সেখানকার শিল্পকলা দেখেছিলাম,

সেই স্বর্গীয় বন্ধু অধ্যাপক

উইলিয়ম উইণ্টার্সলী পিয়ার্সনের

স্মৃতি-প্রতীক-স্বরূপে

সূচী

ভূমিকা

"ভারতের শিল্প-কথা" যে উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে এই বইখানিও লেখবার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে আদেশ পাই। সেই কারণে এ পুস্তকে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তভাবে উরোপের শিল্প-কথার বর্ণনা দিতে হয়েছে। এইরূপ লেখার মধ্যে অসুবিধা অনেক আছে। কেন-না, শিল্প-কলার দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কোন্‌টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং কোন্‌টিকে বাদ দেওয়া চলে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়। তা' ছাড়া, বিদেশী শব্দগুলির উচ্চারণ-সম্বন্ধেও সকলে একমত হতে পারেন না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে লিখলেও ত্রুটী থাকার সম্ভাবনা আছে।

"ভারতের শিল্প-কথা"র মতই পুস্তকটিতে লেখক নিজের মতামত প্রচার করবার অনর্থক চেষ্টা করেন নি। কেন-না, এই পুস্তক-প্রচারের উদ্দেশ্য তা' নয়। এর উদ্দেশ্য জনসাধারণের নিকট দেশ-বিদেশের শিল্পকলার পরিচয় দেওয়া এবং যা'তে আরো সে বিষয় জান্‌বার উৎসাহ-বৃদ্ধি হয়, তা'র চেষ্টা করা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধু উদ্দেশ্য এই লেখকের হাতে কতটা সফলতা লাভ করেছে, তা'র বিচার সুধী পাঠকেরাই করবেন।

লক্ষ্ণৌ
১১. ৫. ৪০

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

উরোপের শিল্প-কথা

স্থাপত্যকলা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহানিবাসগুলি ছাড়া কিছু কিছু পাথর সাজিয়ে পাঁজার মত করে গাঁথা, কতকটা এস্‌কিমোদের (Eskimo) বরফের বাড়ীর-মত স্থাপত্যের চিহ্ন কিছু কিছু সার্ডিনিয়া (Sardinia) দ্বীপে এবং মাল্‌টার (Malta) হল্‌-সাফলিনিতে (Hal Saflieni) যা পাওয়া গেছে, সেগুলি স্থাপত্য-কলা-নামের অযোগ্য। তাই উরোপের প্রাচীন-কালের শিল্পের বিষয় বলতে হলে ইজিপ্তের (মিসরের) কথা আগে বলা প্রয়োজন। ইজিপ্তের ফারাও (Pharaoh) রাজাদের পূর্ব্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে কি ছিল, তার কোন খবর প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেন নি। প্রথম ফারাওদের 'মেনেস' (Menes) বলা হতো। এদের সময় থেকেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। নীল নদের মোহানায় প্রথম ফারাওরা রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন এবং খৃঃ পূঃ ৪০০০ অব্দের মধ্যে তাঁরা বিরাট সমাধি-মন্দিরগুলি নীল নদের তীরে তৈরী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ ও মিশরের স্থাপত্য।

করে গিয়েছিলেন; সেই 'পিরামিড' সমাধি-মন্দিরগুলি জগতের আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য-হিসাবে আজও লোকদের মুগ্ধ করচে!

উরোপের প্রাচীন স্থাপত্যকলার প্রেরণা মিসরের এই সকল স্থাপত্যকলাই দিয়েছিল। মিসরের স্থাপত্যকলার মারফৎ আসিরিয়া (Assyria), বাইজান্টাইন (Byzantine), রোমানাস্ক্ (Romanesque) প্রভৃতি শিল্প-কলা অনুপ্রাণনা লাভ করেছিল। মিসরের স্থাপত্যের প্রধান পরিচয় তার পিরামিডগুলি। এই সময়কার ছোট বড় মাঝারি এবং বিরাট আকারের পিরামিডগুলি মৃত রাজন্যদের ও প্রধানদের স্মৃতি-মন্দিররূপে তৈরী হ'ত; আর ধনী গৃহস্থের জন্যে তৈরী হ'তো 'মাস্তাবা' (Mastaba)। পিরামিডগুলি তৈরী হ'তো বিরাট নৈবেদ্যের মত পরকলা আকারের। এর মধ্যে কোনো কোনোটির ভিতরের ঘরে (গর্ভগৃহে) মৃত ব্যক্তির সকল প্রকার আসবাব-পত্র ও অস্থি-আধার পাওয়া গেছে। এই অস্থি-আধারটিকে 'মামি' বলে। পিরামিডের কোনো কোনোটিতে প্রবেশ-দ্বার নেই, দ্বারের মত আকার বা নির্দ্দেশটুকুমাত্র পাওয়া যায়। অনেক সময় আসলে ঠিক্ কোন্ স্থানে মৃত ব্যক্তির 'মামি' বা ধনদৌলত লুকানো আছে তার সন্ধান করা শক্ত হয়ে পড়ে। এখনো অনেক পিরামিডের গর্ভগৃহ অনাবিষ্কৃতই আছে।

মিসরের স্থাপত্যকলার মধ্যে কেবল কলা-কৌশল নয়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি ভাবে যে সেগুলিকে তৈরী করা হয়েছিল, তা'ও ভাববার বিষয়। এগুলির মধ্যে অনেক স্থাপত্য-কৌশল (Engineering problems) আছে।

প্রথমত অত উঁচু ক'রে বিরাট গাঁথুনি পাথরের স্থাপত্য বিজ্ঞান-সঙ্গত প্রণালীতে গেঁথে তোলা তখনকার দিনে কি করে যে সম্ভব হয়েছিল, তা' বুঝে ওঠা শক্ত। প্রাচীন মিসরের স্থাপত্যের বিশেষত্ব হ'ল তার খিলানগুলি, দেখলেই মনে হয় যেন কাঠ সাজিয়ে গেঁথে তোলা হয়েছে। আমাদের দেশেও আদিম বৌদ্ধ স্থাপত্যেও এইরূপ কাঠের কাজের ভাব পাথরের অট্টালিকায় দেখতে পাওয়া যায়। সব চেয়ে প্রাচীন সক্কারার (Sakkara) পিরামিডটি চারটি থাকে সাজানো ভাবে তৈরী। এটি তৃতীয় পংক্তির (Third Dynasty) রাজাদের তৈরী বলে জানা যায়। সুফিসের (Suphis) পিরামিডটিই সব চেয়ে বিরাট এবং তার বয়স প্রায় খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর। চৌকোধাঁচায় এর নীচের দিকটা তৈরী এবং নৈবেদ্যের মত উপর দিকটা ছুঁচলো আকার ধারণ করেছে। তার একটি প্রান্ত ৭৬০ ফুট এবং সেটি উঁচুতে ৪৮৪ ফুট। এটিতে কোনো একটি সম্রাটের নশ্বর দেহকে স্থান দেবার জন্যেই তৈরী হয়েছিল। কায়রোর দক্ষিণ পশ্চিমে ৬।৭ মাইল দূরে পিরামিডগুলি দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির রাজাদের তৈরী কীর্ত্তি আছে। 'খুফু' (Khufu) খৃঃ পূঃ ৩৯৬৯—৩৯০৮, 'খাফ্‌রা' (Khafra) খৃঃ পূঃ ৩৯০৪—৩৮৪৫ অব্দের বলে জানা গেছে। এগুলিকে চিওপস্ (Cheops), 'সেফ্‌হারণ' (Cephren) এবং মাইসেরিনাস্ (Mycerinus) সাধারণতঃ বলা হয়। ভারতবর্ষে যেমন বৌদ্ধস্তূপগুলি বুদ্ধের অস্থি ও স্মৃতি রক্ষা করার জন্য তৈরী হয়েছিল, মিসরের পিরামিডগুলিও তেমনি রাজন্য-দের স্মৃতি-মন্দির। বৌদ্ধদের স্তূপ অর্দ্ধবৃত্তাকার এবং মিসরের

পিরামিড একেবারে ঋজু রেখায় যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে আছে মরুভূমির মধ্যে যুগে যুগে রাজন্যদের কীর্ত্তি ঘোষণা করবার জন্য। এই সব পিরামিড ছাড়াও প্রাচীন মিসরের মন্দির ও প্রাসাদের চিহ্নও 'নীল' নদের আশেপাশে এখনো অনেক দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি অধিকাংশই বালির মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। মিসরের পিরামিডের নকলে রোমের 'কাইয়াস সেস্‌টিয়াসের' (Caius Cestius) পিরামিডটি তৈরী হয়েছিল। এ-থেকে বেশ বোঝা যায় যে রোমানেরাও মিশরের প্রভাব কাটাতে পারেন নি।

মিসরের স্থাপত্যকলাকে চারটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) খৃঃ পূঃ প্রায় ৩৫০০ বৎসর থেকে খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পর্য্যন্ত চতুর্থ পংক্তির (Dynasty) রাজাদের রাজত্ব চলেছিল। সেই সময় বড় বড় পিরামিডগুলি তৈরী হয়েছিল। (২) দ্বাদশ পংক্তির রাজত্বকালে বেণী হাসানের (Beni Hassan) ধ্বংসাবশেষ যা এখন আমরা দেখতে পাই সেগুলি প্রায় সবই পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছিল। (৩) অষ্টাদশ ও উনবিংশতি পংক্তির রাজ্যকালে লুক্সর (Luxor) ও কর্ণাকের (Karnak) কীর্ত্তিগুলি তৈরী হয়েছিল। শেষ 'টোলেমিক' (Ptolemaic) যুগের 'এড্‌ফু' (Edfu), ডেন্‌ডেরা (Denderah) এবং ফিলীর (Philea) স্মৃতি-মন্দির ও দেবমন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কায়রোর (Cairo) তিনশত মাইল উত্তরে 'নীল' নদের পূর্ব্বতীরে বিখ্যাত কর্ণাকের মন্দিরগুলি অবস্থিত। অষ্টাদশ পংক্তির রাজত্বের প্রথম ভাগে, তৃতীয় আমেন্‌হোটেপ (Amenhotep III) এই মন্দিরগুলি আরম্ভ করেছিলেন তৈরী করতে এবং

দ্বিতীয় রামেসেস্ (Rameses II) (খৃঃ পূঃ ১৩১৩—১২২৫) সেটিকে শেষ করেন। 'থিবস' (Thebes) রাজাদের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রাচীন মিসরের স্থাপত্যের আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই মন্দিরে 'আমেন' (Amen) 'মুট' (Mat) ও 'খোনসু' (Khonsu) এই ত্রয়ীর পূজা হতো। কর্ণাকের মন্দিরগুলি দেখলে বোঝা যায় যে তার গৃহাবলীর ভিত্তির নক্সা (Ground Plan) কখনো একেবারে ঐক্য বা সামঞ্জস্য বজায় রেখে সাজিয়ে তৈরী করা হয়নি। অথচ তার বাইরের প্রচ্ছদের (facade) মধ্যে বেশ একটা ছন্দগত ঐক্য ও শৃঙ্খলা থাকত।

মিসরের স্থাপত্যে কুমুদ এবং ভারতীয় স্থাপত্যে পদ্ম আলঙ্কারিক নক্সা হিসাবে বহুলভাবে প্রচলিত দেখা যায়। মিসরের থামের মাথায় কুমুদের নক্সা দেওয়া থাকে। থামগুলি সাধারণত গোলভাবে তৈরী এবং কখন কখন তিন বা চারটি করে ধারা কাটা থাকত। থামের মাথার উপরকার কলস বা বৈঠকটি প্রমাণ হিসাবে কিছু ছোট হওয়ায় থামগুলি বেশী ভারি বলে মনে হয়। থামের মধ্যে উঁচু-নিচু দেখানোর জন্যে স্থপতিরা রঙের দ্বারা নানাপ্রকার নক্সা কাটতেন। গ্রীক স্থাপত্যে মিসরের অনেককিছু প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু ক্রমশঃ তার একটি বিশেষরূপ গড়ে ওঠায় আর তাকে চেনা যায় না। এই সব স্তম্ভগুলির আকারের মধ্যে যুগে যুগে যে কত পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা বিশেষ আলোচ্যের বিষয়। এই মন্দিরগুলি ছাড়া দ্বিতীয় রামেসেসের সময় অজন্তা প্রভৃতির মত গুহাগৃহেরও চলন হয়েছিল। ইপসম্বুলের (Ipsamboul) গুহা-মন্দিরগুলি পাহাড়ের গা

কেটে তৈরী হয়েছিল। এই গুহারই সামনে চারটি বিরাট আকারের রামেসেসের প্রতিমূর্ত্তি পাথরে খোদাই করা আছে। থিবসদের (Thebes) রাজত্বকালে আর এক প্রকারের স্মৃতি-মন্দির মৃত ব্যক্তির কবরের জন্যে তৈরী হতো যার প্রচুর নিদর্শন 'দের-এল-ভাড়ি'তে (Der-al-Bahari) দেখতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলি পাহাড়ের গা থেকে স্বতন্ত্রভাবে কেটে বার করা হ'তো। এর দালানের স্তম্ভের সার (colonnades) এবং মূর্ত্তিগুলি বিশেষ দেখবার জিনিষ। প্রতিমূর্ত্তিগুলি প্রায় ২৬ ফুট উঁচু। এগুলি কতকটা ভারতবর্ষের ইলোরা গুহার-মন্দিরের মত পাহাড়ের গা থেকে স্বতন্ত্রভাবে কেটে বার করা। মিসরের স্থাপত্যকলার একটি বিশেষত্ব এই আছে যে দেয়ালের গায়ে কিছু-না-কিছু চিত্রকলা তাতে থাকবেই। এই সময়কার মিসরের লোকেরা যে কত সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিল তা সৌধাবলী থেকেই বেশ বোঝা যায়। মিসরের স্থাপত্যকলায় তার ভিত্তির নক্সা (Ground plan) এবং সামনের প্রচ্ছদচিত্র (elevation) দেখলে বেশ বোঝা যায় যে স্থপতিরা তখনকার কতদূর রূপদক্ষ ছিলেন। ভিত্তি ও দেয়ালের তারতম্য এই ছিল যে ভিত্তিটি খুব চওড়া ক'রে গড়া হ'তো এবং দেয়ালের উপরের দিকটা ক্রমশঃ পাতলা ক'রে গড়া হ'তো। বেশীর ভাগ বাসের জন্যে তৈরী বাড়ীঘর ইট দিয়ে তৈরী হ'তো এবং পিরামিড হ'তো পাথরের। ছাদ সাধারণত পাথরের তৈরী এবং খিলানের উপর কড়ি বরগা থাকত।

অ্যালেকজাণ্ডার-দি-গ্রেট (Alexander the Great) যখন মিসর দখল করেন, তারপর থেকেই মিসরের নিজস্ব যা'

ছিল তার চলন সে দেশে কমে গেল। কিন্তু গ্রীক শিল্পেও মিসরের প্রভাব খুব বেশী দেখা গেল। অ্যালেকজাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত এড্‌ফুতে (Edfu) হোরাসের (Horus) মন্দির মিসরের ধরণের কতকটা হলেও বেশ বোঝা যায় যে সেগুলি সেদেশের লোকের হাতের গড়া নয়। ফিলির (Philae) মন্দিরের স্তম্ভাবলী দেখলে বেশ বোঝা যায় মিসরের সঙ্গে গ্রীসের কিভাবে স্থাপত্য-শিল্পের যোগ ধীরে ধীরে সম্ভব হয়েছিল। মিসরের অসংখ্য কীর্ত্তিকলাপের বিষয় বলা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সম্ভব নয়। আমরা এখন এসিরিয়ার বিষয় কিছু বলব।

উরোপের স্থাপত্যকলার বিষয় বলতে গেলেই যেমন গ্রীসের কথা বলতে হয়, তেমনি গ্রীসের স্থাপত্যকলার কথা বলতে গেলেই এসিরিয়ার (Assyria) উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। এসিরিয়ার লোকেরা একদল যোদ্ধা ছিল এবং ক্রমশঃ দলপুষ্ট হয়ে একটি জাতিতে পরিণত হয়। এই যোদ্ধাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যের মধ্যে একটি গাম্ভীর্য্য ও বিরাট বিশাল ভাব পাওয়া যায় যা অন্য স্থাপত্যে বিরল। প্রথমত এই সময়কার সকল প্রাসাদই খুব উঁচু বেদিকা আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তো এবং সেই কারণেই তার আয়তন বেশ জোরালো ও বড় বলে মনে হ'তো। নিনেভার (Nineveh) নিকট খোরসাবাদের (Khorsabad) ভগ্নাবশেষে সেই সময়কার স্থাপত্যের একটি বিশেষ ধারার বিষয় জানা যায়। প্রাসাদের ঘরগুলির মাঝে মাঝে থাম দেওয়া দালান এবং কোনো কোনো যায়গায় খোলা ছাদ

এসিরিয়া
খৃঃ পূঃ ৮৮৫-৬০৬

আছে। বেশীর ভাগ খোলা দালানের দেয়ালের উপর দিকের অংশ শুখানো ইট দিয়ে তৈরী। খোরসাবাদের প্রাসাদে অনেক বাসগৃহ আস্তাবল ও মেয়েদের বাসোপযোগী বিশেষ প্রকোষ্ঠ বা 'হারেম' ছিল। এসিরিয়ার প্রাসাদগুলির মধ্যে হোমার (Homer) বর্ণিত আল্‌সিনাসের (Alcinous) প্রাসাদের বিষয় বলা প্রয়োজন। প্রবেশপথের সামনে খিলান দেওয়া ঘর এবং তার দুপাশে ডানাওয়ালা মানুষমুখো বিরাট বৃষের প্রতিমূর্ত্তি। এই প্রকার বৃষ-মূর্ত্তি পরবর্ত্তী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পকলায় বহুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। আলসিনাসের প্রাসাদের দরজাগুলির উপর ব্রঞ্জের উৎকীর্ণ নানাপ্রকারের ছবি ছিল। প্রাসাদগুলির রঞ্জনরীতির মধ্যে (motifs) একটি বিশেষ ভাব-সামঞ্জস্য ছিল যা' দেখলেই এসেরিয়ার বলে সর্ব্বদাই জানা যেতো। এগুলি অবশ্য এখন আমাদের নিকট বড়ই একঘেঁয়ে বলে মনে হয়। খোরসাবাদের মত কুইউনজিকের (Kuynujik) প্রাসাদও এসিরিয়ার স্থাপত্যকলার একটি বিশেষ নিদর্শন। হিতাইতদের (Hittites) রাজত্বে উত্তর সিরিয়ায় (Syria) একমাত্র বাবিলোনিয়ার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। হিতাইতরাও এসেরিয়ানদের মত পাথরের প্রসাদ গড়েছিলেন। হিতাইতদের প্রাচীন স্থাপত্যের এবং শিল্পকলায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ দেখা যায়। সুদূর ভারত ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তাদের বাণিজ্য চলত তাও শিলালিপি থেকে জানা গেছে। একটি লিসিয়ান (Lycian) সমাধি আছে একেবারে বৌদ্ধচৈত্য মন্দিরের অনুরূপ। কাঠের কাজের নকলে পাথরে তৈরী হয়েছিল বলে মনে হয়।

উরোপের প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে (Classical Architecture) পাঁচটি বিশেষ ধারার বিষয় জানা যায়। (১) প্রাগ্‌হেলেনিক (Pre-Hellenic), (২) ডোরিক (Doric), (৩) আওইনিক (Ionic) (৪) কোরিন্থিয়ান (Corinthian) এবং (৫) কম্পোজিট (Composite) এগুলির মধ্যে ডোরিক ঔপনিবেশিকদের (Doric colonies) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উত্তর ও দক্ষিণ উরোপের ভাস্কর্য্যের সংমিশ্রণে যে শিল্পকলার উন্মেষ হয়েছিল, সেইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসে জানা যায় যে ট্রাযান (Trajan) যুদ্ধের আগে অ্যাটিকার (Attica) আইওনিয়ানরা এসিয়া মাইনরে গিয়ে বসবাস করেছিলেন এবং সেইখানেই তাঁদের বিশেষ আদর্শটি অর্থাৎ আইওনিয়ান স্থাপত্যের আবির্ভাব হয়েছিল। গ্রীক স্থাপত্যে এই আইওনিয়ানদের প্রভাব বড় বেশী পাওয়া যায় না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এসিরিয়ার স্থাপত্যের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত আছে।

গ্রীক
খৃঃ পূঃ ৬০০—

গ্রীক স্থাপত্যের অতি আদিম দৃষ্টান্ত খৃঃ পূঃ ৬০০ শতাব্দী থেকেই পাওয়া গেছে। সক্রেটিসের (Socrates) মৃত্যুর পর এবং সলোন (Solon) সর্দ্দারের সময়কার অতি প্রাচীন স্থাপত্যকলার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। গ্রীক প্রজাতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাসেডোনিয়ানদের (Macedonian) আধিপত্য-কালে হেলেনিক স্থাপত্য-শিল্পের (Hellenic art) আবির্ভাব হয়। গ্রীক স্থাপত্য-শিল্পে (১) আর্কেইক যুগ (Archaic) ডোরিনদের (Dorin) সময় থেকে পারস্য যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত একটি

বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।—(২) ফিডিয়ান (Phidian) যুগ, অর্থাৎ ঠিক পারস্য যুদ্ধের পরবর্ত্তী কাল থেকে পেলোপনিসিয়ান (Peloponnesian) যুদ্ধের শেষভাগ পর্য্যন্ত একটি ধারা চলেছিল। (৩) পোষ্ট-ফিডিয়ান যুগ (Post-phidian) চলেছিল অ্যালেকজাণ্ডারের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত। (৪) পরবর্ত্তী হেলেনেষ্টিক যুগ (Hellenistic) এবং (৫) তারপরের কোরিন্থিয়ান (Corinthean) এবং বাইজান্টাইন স্থাপত্যের যুগ। 'ডোরিক' ও আইওনিকদের স্থাপত্যে প্রধান বিশেষত্ব ধরা পড়ে থামগুলির গঠনের তারতম্যে। ডোরিক থামের গোড়ার দিকে বৈঠক নেই, সেটি একেবারে সরাসরি উঠেছে এবং তার ধারগুলি ধারালো অর্থাৎ পলকাটা। আইওনিক ও কোরিন্থিয়ান থামগুলি খাজ কাটা কাটা, আর বেশীর ভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকার। তা'ছাড়া কখন কখন 'আইওনিক' থামের নীচের দিকটায় কোনোই কারুকার্য্য থাকে না। সেখানে স্বতন্ত্রভাবে মূর্ত্তি বসাবার ব্যবস্থা থাকে। ডোরিক থামের চেয়ে আইওনিক থামগুলি দেখতে খুব সুন্দর। এই থামগুলি দেখলে দুটি স্বতন্ত্র জাতির মনস্তত্ত্বের খোঁজ পাওয়া যায়। একটি বাইরের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের দিকে, অপরটি জোরালো ভাবের দিকে নজর দিয়েছিল। পারথেনন (Parthenon) প্রাসাদটি ডোরিক স্থাপত্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পারথেননটিতে দেবদাসীদের আবাস ছিল। এটি একটি ধূসর ও সোনালী রঙের মর্ম্মর-নির্ম্মিত প্রাসাদ। এর নক্সাকারী পটির (mouldings) কাজগুলি সব রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভারতবর্ষেও প্রাচীন স্থাপত্য-কলায় রঙ দিয়ে ঘরবাড়ীর নক্সাকারী

কাজগুলিকে ফুটিয়ে তোলার রীতি ছিল। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি গুহা-গৃহে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। পূর্ব্বে যে মিসরের স্থাপত্যের মধ্যে কাঠের তৈরী বাড়ীর নকলে পাথরের ধাঁচায় গড়া ঘর-বাড়ীর উল্লেখ করেছি, এই আইওনিক শিল্পেও তার প্রমাণ আছে। গ্রীক-ডোরিক মন্দিরগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে নিম্নলিখিত কতকগুলি মন্দিরের বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা ঃ—(১) করিন্থের (Corinth) আথেনার (Athena) মন্দিরটি, (২) অলিম্পিয়ার (Olympia) জেউসের (Zeus) মন্দির, (৩) এটিকার নেমেসিসের (Nemesis) মন্দির, (৪) এটিকার দেমেতেরের (Demeter) মন্দির। তাছাড়া ইটালী ও সিসিলির মন্দির ও পোসেইডোনের (Poseidon) মন্দির প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আইওনিক (Ionic) স্থাপত্যের মধ্যে মিসরের প্রভাব যেন বেশী দেখতে পাওয়া যায়। থামের মাথাগুলিতে ঘোরানো (scroll) ভাবটা পারস্য দেশের পার্সিপলিসের (Persepolis) মন্দিরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আইওনিক (Ionic) শিল্প যে প্রাচ্য শিল্পকলার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত সে বিষয় সন্দেহ নেই। এমন কি, আলঙ্কারিক নক্সাগুলির মধ্যেও প্রাচীন পারস্য শিল্পের ভাব পরিলক্ষিত হয়। ডোরিকে যেমন থামের নীচে কোনো বৈঠকই নেই, আইওনিকের বৈঠকগুলি আবার তেমনি বিশদভাবে থাকে-থাকে খাঁজ কাটা পটির (mould) উপর তৈরী। এসিয়া-মাইনরেই বেশীর ভাগ ডোরিক শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে এথেন্সের (Athens) এরেখথেয়ন (Erechtheum)

মন্দিরটিতে এসিরিয়ার হনিসক্‌ল (Honysuckle) ফুলের নক্সার হুবহু নকলে করা কাজ দেখা যায়। বেশীর ভাগ আইওনিক মন্দির যা' এসিয়া মাইনরে আছে, সেগুলিতে খাঁজ কাটা পটির (mould) বাহুল্য থাকায় অনেক সময় তেমন সুন্দর দেখায় না। কিন্তু এথেন্সের মন্দিরটি খুবই সুন্দর। প্রাচীন শিল্পকলার বিশেষজ্ঞ প্লিনীর (Pliny) মতে এফেসাসের (Ephesus) ডায়ানা দেবীর (Diana) মন্দিরটিই সবচেয়ে বড় এবং উচ্চ শ্রেণীর স্থাপত্যের নিদর্শন। দুঃখের বিষয় সেই মন্দিরটি এখন বিধ্বস্তপ্রায়। এমনি আরো একটি মন্দিরের কথা জানা যায়, হালিকারনাসসের স্মৃতি মন্দিরটি। এই মন্দিরটি আগাগোড়া ভাস্কর্য্যকলায় অলঙ্কৃত ছিল। এখনো তার জীর্ণ অংশ যা' পাওয়া যায়, তা থেকেই তার ঐশ্বর্য্য বেশ বোঝা যেতে পারে। এই অট্টালিকাগুলি সবই উঁচু বোনেদের (বেদিকার) উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এসিরিয়ার স্থাপত্যের মত খুব জাঁকালো এবং উঁচু দেখায়।

আইওনিকের সঙ্গে কোরিন্থিয়ান প্রায় জড়িত হয়ে আছে। কোরিন্থিয়ানের থামগুলির মাথায় এক প্রকার কপিপাতার মত একেন্‌থাসের (Acanthus) পাতার নক্সা গড়া থাকত এবং থামের নীচে আইওনিক থামের মত পটি দেওয়া থাকত। গ্রীক মন্দিরগুলি ছাড়া তখনকার রঙ্গমঞ্চ (Amphitheatre) জল-সরবরাহের প্রণালী (Aqueduct) প্রভৃতি অনেক স্থাপত্য-নিদর্শন উরোপে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। মিসর ও গ্রীক মন্দিরের মধ্যে ভিত্তির নক্সাগত কতকটা ঐক্য থাকলেও গ্রীক মন্দিরের দালানই হ'ল

সর্ব্বস্ব আর থামগুলির সজ্জাই বাইরে থেকে বেশী সুস্পষ্ট দেখা যায়, আর মিসরের মন্দিরের থামগুলি ভিতর দিকে সাজানো হ'তো। প্রাচীন গ্রীসের ঘর বাড়ীর ছাদের চিহ্ন বেশী কিছু পাওয়া যায় না। তাই ছাদগুলি যে ঠিক্ কি ভাবে তৈরী হ'তো, তা' এখন জানা যায় না। তবে যতদূর বোঝা গেছে, তা' থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ছাদ ঢালুভাবে কাঠের তৈরী হ'তো এবং তা'তে মর্ম্মর পাথরের টালি সাজানো থাকত। গ্রীক স্থাপত্যের একটি বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে দেয়ালগুলি প্রায় অধিকাংশই মর্ম্মর দিয়ে গেঁথে তোলা। সেখানে মর্ম্মরের খনি থাকায় তা'দের পক্ষে এরূপ সম্ভব হ'য়েছিল। মিসর থেকে নিয়ে এসিরিয়ান, ডোরিক ও আইওনিক থাম-গুলির বিষয় গবেষণা করলে স্থাপত্যকলায় তখন কি ভাবে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের আদান-প্রদান চলেছিল বেশ জানা যায়। এরই মধ্যে গ্রীক তা'র বিশেষত্বটিকে বজায় রেখে চলেছিল। রোমানদের আমলে ডোরিক আইওনিকের সংমিশ্রণে 'তাস্কান' (Tuscan) নামক একটি বিশেষ ধরণের স্তম্ভের আবিষ্কার হয়েছিল। এর চলন খুব বেশী দেখা যায় না। রোমান স্থাপত্যের শেষ ভাগে কোরিন্থিয়ানের চলনই বেশী হয়েছিল।

রোমান স্থাপত্য

এই গ্রীক শিল্পেরই ধারা ইটালীতে রোমান সাম্রাজ্যে (Roman Empire) বিরাট আকার ধারণ করেছিল। তা'র প্রত্যেকটি কথা বলা অসম্ভব। কথায় বলে 'রোমনগর একদিনে তৈরী হয়নি।' তা'র বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থাপত্যকলারই পরিচয় দেবার

চেষ্টা করব। রোমানদের প্রাচীনতম কীর্ত্তিগুলির মধ্যে তা'দের রচিত বিচার-মন্দিরগুলি ব্যাসিলিকাসের (Basilicas) ভিত্তির নক্সা দেখলে অনেকটা বৌদ্ধ চৈত্য মন্দিরের মত মনে হয়। অবশ্য এই সামান্য সাদৃশ্য থেকে বলা যায় না যে গ্রীকের নকলে ভারতীয় চৈত্য মন্দিরগুলি রচিত হয়েছিল। রোমের 'কলোসিয়াম' (Colosseum) স্থাপত্যকলার বিশেষ গৌরবের জিনিষ। সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ক্রীড়া-মঞ্চটি তৈরী; তা'র মধ্যে রাজন্যদের বসবার বিশেষ স্থান, খেলওয়াড়দের বিশ্রামাগার, প্রভৃতি সকল প্রকার সুব্যবস্থা আছে। তা' ছাড়া এক লক্ষ দর্শকদের এক সঙ্গে দেখবার স্থান সঙ্কুলন করা হ'য়েছে তারই মধ্যে। পম্পিয়াইতে (Pompeii) যে ক্রীড়ামঞ্চটি আছে, সেটিও খুব সুন্দর। খৃঃ পূঃ ৬১ অব্দের পূর্ব্বে কোনো রোমান সম্রাট পাকা ক্রীড়ামঞ্চ তৈরী ক'রতে দেন নি। কাঠের তৈরী হ'ত এবং পরে ভেঙে ফেলা হ'তো। ক্রীড়ামঞ্চ ছাড়াও রোমান যুগে স্নানাগারেরও বাহুল্য দেখা যায়। উরোপ শীত-প্রধান দেশ হলেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব-উরোপের আবহাওয়ায় গ্রীষ্মের তাপ যা' আছে, তা'তে স্নানের বিশেষ প্রয়োজন হয়। কারাকাল্লার (Caracalla) স্নানাগারটি প্রায় ১১৫০ ফুট পরিধি নিয়ে তৈরী হয়েছিল। স্নানোপযোগী বিরাট বাঁধানো জলাধারটির চার পাশে সংখ্যাতীত সার সার প্রকোষ্ঠ এবং দালান প্রভৃতির বর্ণনা এক নিঃশ্বাসে করা যায় না। স্নানাগার ছাড়া সেতু নির্ম্মানেও রোমানদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ডান্যুব (Danube) নদীতে ১৫০ ফুট চওড়া খিলানের উপর সেতু নির্ম্মাণ সে সময়ে হয়েছিল। ফরাসী

দেশে 'নিঁমে' (Nimes) প্রদেশে ডবল খিলান দেওয়া জলের প্রণালী (aqueduct) যা' রোমান স্থপতিরা করে গেছেন, তা' এখনকার কালে ভাববার বিষয়। তা' ছাড়া যুদ্ধ-জয়-ঘোষণার জন্যে তোরণদ্বার, স্তম্ভ রচনারও রীতি ছিল। কন্‌স্তানটাইন রাজার স্মৃতি-তোরণ ছাড়া রোমের সেকরার তোরণ (Arch of the Goldsmith) এবং উরোপের অন্যান্য স্থানের যথা 'পোর্ত দ' অরেঁা' (Porte d' Arroux) 'পোর্তা-নিগ্রা' (Porta Nigra) প্রভৃতির কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে। ত্রাজানের (Trajan) স্তম্ভটিও রোমান সম্রাট ত্রাজানের সময়কার দাসিয়ান (Dacians) ও পার্থিয়ানদের (Parthians) যুদ্ধের বিষয় ঘোষণা ক'রচে। এটি ১৩২ ফুট ১০ ইঞ্চি উঁচু এবং ডোরিক ধরণের স্তম্ভ। এই স্তম্ভটির নীচে এবং তার চার পাশে যুদ্ধের বিবরণ উৎকীর্ণ করা আছে। স্থাপত্যকলা-অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে সে বিষয় বলা হবে। মার্কুস অরেলিয়ুসের (Marcus Aurelius) স্তম্ভটিতে খুব কারিগরি কাজ আছে, কিন্তু ত্রাজানের স্তম্ভটির মত অত সুন্দর নয়।

রোমানদের সাধারণতঃ বসতবাড়ী দু রকমের ছিল। একটিকে বলা হতো 'ইনসুলা' (Insula) এবং অপরটিকে বলা হতো 'ডোমাস' (Domus)। 'ডোমাস' বলা হতো সেই অট্টালিকাগুলিকে, যেগুলি কেবলমাত্র একটি পরিবারের বাসের জন্যে তৈরী হতো। আর 'ইনসুলা' হ'ল সার সার বাড়ী যার নীচে দোকানপাট এবং উপরে পরিবারবর্গ থাকবার জন্যে তৈরী দোতলা ঘর আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভিটা খনন দ্বারা এইরূপ অনেক বাসস্থান আবিষ্কার করেছেন।

রোমানদের বাড়ীর ভিত্তির নক্সা (ground plan) বিচিত্র ধরণের, কেননা নানাবিধ ব্যাপারের জন্যে তৈরী হওয়ায় এত বৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে। বাড়ীর মেঝেগুলি প্রায় সবই পচ্চের কাজে (mosaic) চিত্র বিচিত্র করা। বাড়ীর দেয়ালগুলিও খুব মজবুতভাবে তৈরী। পূর্ব্বের গ্রীক-রীতিতে বড় বড় পাথর দিয়ে গেঁথে দেয়ালগুলি তুলতেন না। রোমানেরা ছোট ছোট ইট বা পাথর এবং একপ্রকার বজ্রলেপ (mortar) দিয়ে গাঁথতেন যাতে দেয়াল খুবই মজবুত হ'তো। তা' ছাড়া যখন খুব বড় বা উঁচু দেয়াল তুলতে হতো, তখন হেরিঙ মাছের (Herring) হাড়ের মত এক একটা মাঝে মাঝে বড় পাথরের বাঁধ (Bond Courses) দিয়ে দেয়ালকে আরো সহজভাবে মজবুত করে তৈরী করার প্রথা ছিল। তা' ছাড়া উরোপে ছাদ তৈরীর রীতি যা' রোমানেরা প্রবর্ত্তন করে গেছেন তা'ই এখনো চলছে। গ্রীসের প্রাচীন ঢালু ছাদের যায়গায় পাথরের কড়ি বরগা দিয়ে ছাদ এই রোমানেরাই প্রথম উরোপে আবিষ্কার করেছিলেন। মানুষ যুগে যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষের অভিজ্ঞতায় এগিয়ে চলে। শিল্পে পদে পদে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমানদের চূণ, ইট, পাথর এবং কাঠের দ্বারা ঘরবাড়ী তৈরীর অভিজ্ঞতায় যেমন উরোপের পরবর্ত্তী স্থাপত্যকলা এগিয়ে গিয়েছিল, আমাদের দেশেও আদিম হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের তৈরী ইট কাঠ চূণের দ্বারা হর্ম্ম্য তৈরীর অভিজ্ঞতা আজও স্থপতিদের কাজের মধ্যে প্রকাশ পাচ্চে।

রোমান আলঙ্কারিক শিল্পে গ্রীক-প্রভাব খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। রোমান স্থাপত্যের মধ্যে বেশ একটা

সহজ দৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় আছে। বড় বড় দালান, থামের সার দিয়ে ঘেরা এবং তার বাঁধুনি ও গাঁথুনির বিষয় দেখলে বাস্তু-কল্পনার মধ্যে বেশ একটা ঔদার্য্যের বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায়। তার মধ্যে এতটুকু কৃপণতা বা অবোনেদি ভাব নেই। রোম সাম্রাজ্য যেমন একদিকে এসিয়াখণ্ডের পশ্চিম অংশে এবং উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়া পড়েছিল, তেমনি তা'র স্থাপত্যের কীর্ত্তিও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সব দেশে। তা'ই তুনিসিয়া (Tunisia) আল্‌জেরিয়া (Algeria) মরক্কো (Morocco) এবং ত্রিপলিতে (Tripoli) রোমানদের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। সিজারের (Caesar) সময় প্রাচীন রোমানরা তুনিসিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। জল সরবরাহের জন্যে প্রণালী (Aqueduct) প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। সম্রাট হাড্রিয়ানের (Hadrian) সময় ৬০ মাইল ব্যাপী জল সরবরাহের জন্যে পাকা গাঁথুনির খিলানের উপর যে প্রণালীটি তৈরী হয়েছিল, তা এখনো অটুট আছে। এখন তুনিসিয়া ফরাসীদের অধীনে আছে এবং যখন জল সরবরাহের প্রয়োজন হয় তখন সেই প্রাচীন রোমানদের তৈরী কূপেরই এখনো পর্য্যন্ত স্মরণ নিতে হয় সেখানে। এই তুনিসিয়ার নিকট 'এল-জেমেতে' (El-Jem) বিরাট ক্রীড়ামঞ্চের (Amphitheatre) ধ্বংসাবশেষ যা' আছে, তা'তে ৬০ হাজার দর্শকের বসবার ব্যবস্থা ছিল বলে বোঝা যায়।

রোমানদের সকল কীর্ত্তির বর্ণনা করা অসম্ভব তা' পূর্ব্বেই বলেছি। এখন কয়েকটি বিশেষ কীর্ত্তির বিষয় বলব। এথেন্সের (Athens) এ্যাক্রোপলিসের (Acropolis)

মন্দিরটি পেরিক্লিসের (Pericles) উদ্যোগে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে পুনঃ নির্ম্মাণ শেষ হয়েছিল। পারস্য যুদ্ধের ফলে সেটি তার পূর্ব্বে ধ্বংস হয়েছিল। সেখানে যে মিনার্ভা দেবীর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত আছে, তা'তে বিখ্যাত শিল্পী ফেইডিয়াসের (Pheidias) হাতের অনেক ভাস্কর্য্যকলা শোভিত আছে। ফেইডিয়াস ও পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর এ্যাক্রোপলিসে বিরাট তোরণটি (Propylaea), মিনার্ভা নিকের (Minerva Nike) মন্দিরটি এবং এরেখ্‌থেয়ম (Erechtheum) মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল। এই মন্দিরটির মধ্যে একটি বিরাট ব্রঞ্জের প্রদীপ আছে। এই প্রদীপটির গায়ে এ্যাকেন্‌থাসের (Acanthus) পাতার নক্সা আছে। শিল্পী ক্যালিমেকাস্ (Callimachus) এটি তৈরী করেছিলেন এবং ইনিই করিন্থিয়ান-ধরণের থামের প্রথম প্রচলন করেন বলে অনেকে অনুমান করেন। রোমানদের তৈরী স্থাপত্য কীর্ত্তির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বাস্তুশিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। (১) অগাষ্টাস ও রোমের মন্দির যেটি নিমেঁতে (Nimes) আছে, (২) রোমের ভাগ্যদেবীর মন্দিরটি (Temple of Fortuna Virilis), (৩) রোমের ভেস্তার (Vesta) মন্দির, (৪) টিভোলির তথাকথিত সাইবিলের (Sybil) মন্দির, (৫) লাথামের (Lathum) কোরির (Cori) মন্দির, (৬) পেরুজিয়ার (Perugia) তোরণদ্বার, (৭) রোমের ক্যাপিটোলিনের (Capitoline) মন্দির, (৮) ইউরিসাকাসের (Eurysacas) সমাধিমন্দির, ফ্লাভিয়ান (Flavian) ক্রীড়ামঞ্চ, টাইটাসের (Titus) তোরণদ্বার, ত্রাজানের তোরণ মন্দির ও স্তম্ভ এবং রোমের প্যান্থিয়ন (Pantheon)

আর এণ্টনিয়স্ ও ফস্‌টিনার (Antonius and Faustina) মন্দির। জেনাস কোয়াড্রিফোনের (Janus Quadrifons) তোরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা'ছাড়া এথেন্সের হাড্রিয়ানের তোরণদ্বার, মন্দির, কবর, প্রাসাদ প্রভৃতি, বারসিলোনার (Barselona) মন্দির, নিমের (Nimes) ও (Pompeii) পম্পিয়াইয়ের ক্রীড়ামঞ্চ, কারাকেলার (Caracalla) স্নানাগার এবং পেট্রার (Petra) পাহাড়ের কোল কেটে তৈরী গুহা-মন্দিরগুলির কথা বল্‌লে তবে রোমানদের বিরাট স্থাপত্যের কথা সামান্যভাবে কিছু বলা হয় মাত্র। এখনো রোমান কীর্ত্তি মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হচ্চে। সম্প্রতি কনস্তান্টিনোপ্‌লের সাধারণ বসতবাড়ীর ভিতের নীচে বিরাট ক্রীড়ামঞ্চ (Hippodrome) যা' আবিষ্কৃত হয়েছে, তা' একটি স্থাপত্যকলার অপূর্ব্ব ব্যাপার।

রোমান যুগেই আবার একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটল সম্রাট্ কনস্টানটাইনের (Constantine) খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা নেবার সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর আমোলের গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা পেগানধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হলেন, এমন কি তাদের মন্দিরের ছায়া মাড়াতেও চাইতেন না। এই সময় থেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-মন্দিরের একটি স্বাতন্ত্র্য ভাব দেখা দিতে আরম্ভ হ'ল। এদেরই 'ব্যাসিলিকাস' (Basilicas) হ'ল প্রথম গির্জ্জা—এগুলিকে গির্জ্জার 'আদি-পুরুষ' বলা যেতে পারে। উরোপের পরবর্ত্তী সকল গথিক গির্জ্জাগুলির ভিত্তির নক্সা (Ground plan) দেখলেই বোঝা যায় যে এই সকল গির্জ্জার মধ্যে প্রাচীন

সনাতনী খৃষ্টিয় স্থাপত্য

'ব্যাসিলিকাসের' ভাব নিহিত আছে। মোগলযুগের প্রারম্ভে আমাদের দেশে যেমন কুতবুদ্দিন প্রাচীন মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়েছিলেন, তেমনি খ্রীষ্টান রোমানেরাও সে সময়কার 'ব্যাসিলিকস' গির্জ্জাগুলি প্রাচীন পেগান মন্দির ভেঙেই গেঁথে তুলেছিলেন। তাই দেখা যায় এই গির্জ্জায় নানা-প্রকারের থাম ও কানিসের অদ্ভুত সমাবেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে বেশ একটু অবোনেদি ভাব আছে। এই সকল

ইটালীর রোমানাস্ক স্থাপত্য ১০০—১৩০০ খৃঃ

ব্যাসিলিকাস গির্জ্জার আবির্ভাবের পরেই 'রোমানাস্ক' (Romanesque) যুগের অভ্যুদয় হ'ল। এই সময়কার গির্জ্জার মাথায় ছুঁচলো চূড়া ছিল না, গোল গম্বুজই তখন দেখা দিয়েছিল। রোমানাস্ক স্থাপত্যের নিদর্শন 'মোডেনার' (Modena) গির্জ্জা, বর্গো (Borgo), সান-ডোনিনোর (San-Donnino) এবং ফারারার (Ferrara) গির্জ্জা, পার্মার (Parma) ধর্ম্মমন্দির (Baptistery) প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া একাদশ খৃষ্টাব্দীর পূর্ব্ব-ভাগেই পিসাতে (Pisa) স্থাপত্যকলার নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। পুরাতন রোমান কৃষ্টির উপর ভিত্তি স্থাপন ক'রে রোমানাস্ক শিল্প এক অপূর্ব্বভাব ধারণ ক'রেছিল। পিসার আটতলা বিরাট মিনারটি (Tower) পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি। সেটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে কি ভাবে যে বেঁকে এখনো দাঁড়িয়ে আছে তা' কেউই আজ পর্য্যন্ত নির্ণয় করতে পারেন নি। পিসায় আরো একটি গোল গম্বুজ দেওয়া ধর্ম্মমন্দির আছে। সব চেয়ে সুন্দর এবং উরোপের স্থাপত্যকলার গৌরবস্বরূপ সেখানকার

১০০৬ খ্রীষ্টাব্দের তৈরী শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের বিরাট গির্জ্জাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার প্রত্যেক অংশটির কারিগরি, ভাস্কর্য্য-চিত্র প্রভৃতি খুঁটিয়ে দেখবার মত। লিগুরিয়াতে (Liguria) ঠিক পিসার মতই আবার স্থাপত্যকলা দেখা দিয়েছিল। এখানে কতকগুলি রোমানাস্ক নিদর্শন আছে। ইটালীতে এগুলিকে delle quattro fabriche বলে। তা'তে আছে কতকগুলি গির্জ্জা এবং সঙ্ঘ। ক্যাম্পোসান্তো (Camposanto) গির্জ্জাটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়। এটি এখানকার মধ্যে রোমানাস্ক যুগের একটি বিশেষ স্থাপত্য বলে খ্যাত। রোমানাস্ক যুগে ইটালীতে লোম্বার্দ্দ (Lombard) শিল্পীদের আদর্শে এই বিশেষ ধরণটি চলেছিল।

সম্রাট কন্‌স্তানটাইন যখন রোম থেকে বাইজান্তিয়ামে (Byzantium) রাজধানী তুলে নিয়ে গেলেন, তখন তার নামকরণ করলেন কন্‌স্তান্তিনোপল্‌'। তখন থেকেই বাইজান্তাইন (Byzantine) স্থাপত্যের অভ্যুদয় হ'ল। যদিও ঠিক তৎকালের গির্জ্জা এখন সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দীর গির্জ্জা কনস্তান্টিনোপ্‌লে দেখতে পাওয়া যায়। গোড়ায় গোড়ায় যেরূপ গির্জ্জার মাথায় গম্বুজ দেওয়া থাকত এ-গুলিও কতকটা সেইরূপ। এরই আর একটি রূপ তখনকার ব্যাসিলিকা (Basilica) গির্জ্জায় রোমে পাওয়া যায়। 'সানটা সোফিয়া'র (Santa Sophia) বিরাট গির্জ্জাটি কনস্তান্টিনোপলে ৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। এটির মাথায় চাপা ধরণের গম্বুজ আছে। এটির পরিধি ১০৭ ফুট এবং উচ্চতা ৪৬ ফুট। এই গির্জ্জাটির বাইরের কোনোই

বাইজান্তাইন স্থাপত্য ৩৩০

চাক্‌চিক্য নেই, তার ভিতরের সব কাজ খুঁটিয়ে তৈরী করা হ'য়েছিল বলে বোঝা যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা এই গির্জ্জাটি "স্বর্গ থেকে ঝুলিয়ে রাখা" আছে বলে থাকেন। বাইজান্তাইন স্থাপত্যের বিশেষত্ব বোঝা যায় তার প্ল্যানটি থেকে। গির্জ্জার ঠিক মাঝখানে একটি বিস্তারিত জায়গা আছে এবং তারই ঠিক উপরে গম্বুজ দেওয়া ছাদ, চারটি ছোট ছোট ব্রাকেটের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীর ভিত্তির নক্সাটিও প্রায় চৌকো ধরণের। এই সময়কার গির্জ্জার চূড়া খুব ঢালু করে তৈরী হ'ত যা' পরবর্ত্তী গথিক স্থাপত্যে ক্রমশ একাধিপত্য লাভ ক'রেছিল। জাষ্টিনিয়ানের (Justinian) সেনাপতিরা যখন আফ্রিকা পুনরায় দখল করলেন তখন থেকে সেখানে ছোট ছোট দুর্গ ও মন্দির বাইজান্তাইন ধরণের তৈরী হ'ল। আড্রিয়াতিক (Adriatic) প্রদেশে বাইজান্তাইন আর্ট প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল বলে জানা যায়। পারেনজোর (Parenzo) গির্জ্জা এবং ত্রোসেলোর (Trocello) গির্জ্জায় বেশ বোঝা যায় যে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাসিলিকার ভাবে তৈরী হলেও তার মধ্যেকার সকল কারিগরিই বাইজান্তাইন শিল্পীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ভিনিসের সেণ্ট মার্ক নামক (St. Mark) গির্জ্জাটি যদিও ধ্বংস হওয়ার পর পুনরায় তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে এখনো বাইজান্তাইন শিল্পীদের হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ ইটালীতে নর্ম্মান্ সর্দ্দারদের স্থাপিত সিসিলি (Sicily) রাজ্যে যে সব ব্যাসিলিকাস এবং গির্জ্জা তৈরী হয়েছিল তার মধ্যেও বাইজান্তাইন শিল্পীদের কাজের পরিচয় আছে। পালেরমোর (Palermo) প্রাচীনতম নৌসেনাপতির admiral) গির্জ্জাটিতে এবং প্যালাটাইনের (Palatine)

গির্জ্জায় এইরূপ বাইজান্তাইন কাজ অনেক দেখা যায়। মন্‌রীলের (Monreal) প্রকাণ্ড গির্জ্জাটি পরে নতুন করে গড়া হলেও বাইজান্তাইনের কিছু কিছু পরিচয় মেলে। বাইজান্তাইন শিল্প ম্যাসিডোনিয়া (Macedonia) পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যেই তার বেশী প্রভাব দেখা যায়। এখনো রুষের স্থাপত্যে বাইজান্তাইন রীতি চলে আসছে।

গথিক যুগ
১১২০-১৫০০ খৃঃ

বাইজান্তাইনের পরে য়ুরোপের উত্তর মহাপ্রদেশে যে গথিক স্থাপত্যের উদ্ভব হয়েছিল তারই কথা সংক্ষেপে কিছু বলব। এই গথিক স্থাপত্যের প্রভাব আল্‌প্‌স (Alps) পর্ব্বতের উত্তর ভাগেই দেখা যায়—ইতালীতে তার বেশী চলন হয়নি। নিকোলো পিসানো (Niccolo Pisano) এবং গিওটোর (Giotto) সময় (১২৮০—১৩৩০ খৃঃ) ছুঁচলো চূড়ো দেওয়া গথিক গির্জ্জার বিশেষ উন্নতি হ'য়েছিল। সমগ্র য়ুরোপের নানা স্থানে গথিক হর্ম্ম্যাবলীর আর অন্ত নেই। আমরা এখানে কেবল কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গথিক ধরণের গির্জ্জার উল্লেখ ক'রব। গথিক স্থাপত্যের মধ্যে প্রধান দেখবার কথা তার সহজ সরল রেখাগুলি যেন উঁচুর দিকে বেগে উঠে চলেছে আকাশকে ছোঁবার জন্যে। তাই গথিক স্থাপত্যে বেশ একটা ঔদার্য্যের ভাব মনে আনে। য়ুরোপের অনেক প্রাচীন দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ এই গথিক আদর্শে খুব মজবুত ভাবে তৈরী। রোঁর (Rouen) সেণ্ট ম্যাক্‌লোর (Saint Maclor) গির্জ্জার বিশেষত্ব এই যে তার চারপাশের প্রবেশ দ্বারের খিলানের উপরের অংশ শিখার মত

ত্রিকোণভাবে উপরের দিকে ছুঁচলো হয়ে উঠে গেছে। ঠিক সূর্য্যরশ্মি-বিকীরণের ভাব থাকায় সেটিকে র‍্যাডিয়েটিঙ (Radiating) ধরণ বলা হয়। এর পরেই প্যারিসের 'নতোর দাম' (Notre Dame), ইংলণ্ডের সেণ্ট পল (St Paul), ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবি (Westminster Abbey), ডারহামের (Durham) ক্যাথিড্রল (Cathedral) বারগসের (Burgos) গির্জ্জা, তোলেদোর (Tolado) গির্জ্জা প্রভৃতি অসংখ্য গির্জ্জার নাম করা যেতে পারে, যেগুলি গথিক স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গত মহাযুদ্ধে অনেক বিখ্যাত গির্জ্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

গথিক স্থাপত্য ফরাসীদের মারফৎ স্পেনে প্রবেশলাভ করেছিল। লিওঁ (Leon), বার্গস (Burgos) এবং তোলেদোর (Toledo) গির্জ্জাগুলিতে খাঁটি গথিক ভাব দেখতে পাওয়া যায়। বাকি আরাগণ (Aragon) রাজ্যে বার্সিলোনায় (Barcelona) গির্জ্জার মধ্যে মুরদের (Moor) প্রভাব নেই বল্লেই হয়। তাছাড়া মেদিনা-দেল-কাম্পোর (Medina-del-campo) 'মোটা' (Mota) প্রাসাদটি, সেগোভিয়ার (Segovia) কোকার (Coca) প্রাসাদ, ভ্যালেন্সিয়ার (Valencia) প্রাসাদ, ট্যারাগোনার (Tarragona), জেরোনার (Gerona) 'পামা-দি-মালোর্কার' (Palma-de-mallorca) গির্জ্জাগুলি স্পেনের গথিক আদর্শে গড়া স্থাপত্যকলা। ইটালীর গথিক আদর্শে গড়া স্থাপত্যের মধ্যে কয়েকটির নাম দেওয়া গেল। যথা :—ডোগেস (Doges', কণ্টারিনি, (Contarini) গাষ্টানিয়ানি (Giustiniani) পিসানি (Pisani), ডাণ্ডোলো (Dandolo) ফস্‌সারি (Foscari) প্রভৃতি

প্রাসাদাবলী। তাছাড়া মিলানের (Milan) মর্ম্মর প্রস্তরের বিরাট গির্জ্জাটি জিয়ান গ্যালিয়াজো ভাইকোন্টির (Gian Galeazzo Visconti) দ্বারা ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোমোর (Como) গির্জ্জাটি একটি গথিক ও রোমানাস্ক-সংস্করণ। অরভিয়েটোর (Orvieto) গির্জ্জা, সিয়েনার (Siena) গির্জ্জা, এ্যাসিসির (Assisi) সেণ্ট ফ্রান্সিস্কো (St. Francesco) গির্জ্জা, ফ্লোরেন্সের (Florence) সিনো-রিয়ার (Signoria) প্রাসাদ, পোদেস্তার (Podesta) প্রাসাদ, এ্যাপুলিয়ার (Apulia) প্রাসাদ, (Cartle del monte)। নেপ্‌লসের (Naples) সেণ্ট জিওভানি-দে-পাপাকোডার (St. Giovanni de Pappacoda) গির্জ্জা, সেণ্ট ডোমি-নিকোর (St. Domenico) গির্জ্জা, সম্রাট ল্যাডিসল্যাসের (Ladislaus) সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালারমোর (Palarmo) মোডিকার (Modica) এবং সারডেনিয়াব (Sardenia) গির্জ্জাগুলি প্রায় সবই গথিক আদর্শে তৈরী। জার্ম্মানীতে গথিক ধরণের স্থাপত্য ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'রাইন' নদীর উপকূলে দেখা দিয়েছিল। ষ্ট্রাস্‌বার্গ (Strassburg), ফ্রাইবার্গ (Freiburg) এবং কঁলোর (Cologne) গির্জ্জাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ডানিউব' নদীর তীরেও তিনটি বিরাট গথিক গির্জ্জা উল্‌ম (Ulm) র‍্যাটিস-বোন (Ratisbon) এবং ভিয়েনায় (Vienna) তৈরী হয়েছিল। বোহেমিয়ায় (Bohemia) প্রাগ রাজধানীর (Prague) গির্জ্জাটি, পোলাণ্ডের (Poland) ক্রাকাও (Cracow) বিশ্ব-বিদ্যালয়, এস্‌থোনিয়ার (Esthonia) রিগা (Riga) গির্জ্জাটি, ফিন্‌ল্যাণ্ডের (Finland) আবু (Abo) গির্জ্জা, সুইডেনের

(Sweden) আপ্সালা (Upsala) এবং ডেনমার্কের রোস্-কিল্দে (Rokilde) গির্জ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুইট্জার-ল্যাণ্ডে (Switzerland) বাসেলের (Basel) গির্জ্জা, বেলজিয়ামে (Belgium) এ্যাণ্ট্ওয়ার্পের (Antwerp) গির্জ্জা, ব্রাসেল্সের (Brusselles) গির্জ্জা, গথিক ধরণের বিশেষ স্থাপত্য। তা'ছাড়া প্যালেস্টাইনে (Palestine), সাইপ্রাসে (Cyprus) ক্রুসেডার-দের (Crusaders) দ্বারা স্থাপিত অনেক গথিক গির্জ্জা আছে।

এই সকল গির্জ্জাগুলির মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestant) এবং ক্যাথলিক (Catholic) গির্জ্জার মধ্যেও বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। রোমান ক্যাথলিকেরা অনেকটা মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী, তাই তাঁদের গির্জ্জায় একটু বেশী রকম ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার অতিশয্য দেখা যায়। এই সব গির্জ্জাগুলি ছাড়াও কোনো একজন প্রধান ধর্ম্মযাজকের (Abbot) অধীনে বাস ক'রে ধর্ম্ম প্রচার করার জন্যে সঙ্ঘ তৈরী করার প্রথা ছিল। তাকে 'য়্যাবি' (abbey) বলা হ'তো। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দী থেকেই এই সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ক্রমশ ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ১৫ হাজার ৭টি সঙ্ঘ উরোপের নানাস্থানে গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। ইংলণ্ডে সম্রাট হেন্‌রী-দি-এইট্থের (Henry VIII) হুকুমে এই সঙ্ঘ উঠে গিয়েছিল। পরে দেশ-বিদেশে উরোপের শক্তিশালী রাজারা উপনিবেশ স্থাপনা এবং রাজ্য বিস্তার করায় খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা এইরূপ গথিক গির্জ্জা উরোপের বাহিরে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

উরোপে ১৬শ শতাব্দীকে শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় জুলিয়াস (Julius II) এবং দশম লিওর (Leo X)

দরবারে অসংখ্য শিল্পী প্রতিপালিত হয়েছিল এবং তা'রই ফলে ইটালীর নব শিল্প-অভ্যুদয়ের (Italian Renaissance) যুগ প্রবর্ত্তিত হল। মাইকেল আঞ্জিলোর মত দিগ্‌গজ শিল্পী সেণ্ট পিটারের (St. Peter) গির্জ্জাটির পরিকল্পনা করলেন এবং তারই অনুপ্রেরণায় উরোপে এই গির্জ্জাটির গম্বুজের নকলে হাজার হাজার স্থাপত্যকলা গড়ে উঠল নানা স্থানে। এই ধরণের স্থাপত্যের মধ্যে ভেনিসের (Venice) সান্‌সোভিনো (Sansovino) গির্জ্জা, সামিচেলের (Sammichale) গির্জ্জাটি, ভেরোনায় (Verona) এবং ভিসেঞ্জায় (Vicenza) প্যালাডিও (Palladio) গির্জ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা' ছাড়া মিলানের (Milan) বারমেণ্টে (Barmante) গির্জ্জা, লা পিগ্‌না (La Pigna) উদ্যানের সামনে বারমেণ্টের বিরাট বিজয় তোরণটি, রোমের সেণ্ট কার্লো (St. Carlo) গির্জ্জা, রোমের লোরেটো (St. Mariadi Loretto) গির্জ্জা, ভাটিকানের (Vatican) সিস্‌টিন্ চ্যাপেল (Sistine Chapel) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ইটালীর স্থাপত্যের জের আমরা পাই ফরাসী দেশে ভার্সাই (Versailles), লুভ (Louvre) এবং লুক্সেম্‌বর্গ (Luxemburg) প্রাসাদে এবং প্যারিসের পাঁথিও (Pantheon) ফরাসীর বিশ্ববিদ্যালয়ে (Institute de France) এবং সেণ্ট ডেনিসের (Porte St. Denis) তোরণ-দ্বারে। লণ্ডনের সেণ্ট পল (St. Paul), পার্লিয়ামেণ্ট, ডেনমার্কের প্রাসাদে (Frederiksborg Palace) পোট্‌সডামের (Potsdam) প্রাসাদে সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর স্থাপত্যের মধ্যে ইটালীর প্রভাব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

উরোপের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশে যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ইরাণী শিল্পের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভিয়েনার (Vienna) কার্ল্‌স্‌ক্রিচের (Karlskirche) গির্জ্জাটি আওরঙ্গজীবের স্থাপিত ভারতের যে-কোনো মসজিদের মত মনে হয়। তাতে আওরঙ্গজিবের মসজিদের মতই সামনে তুটি মিনার আছে এবং মাঝখানে গম্বুজ দেওয়া। অবশ্য গম্বুজটি ইটালীর সেণ্ট পিটার গির্জ্জার ধরণে তৈরী। মুস্‌লিম স্থাপত্যকলা ৬৫২ খৃষ্টাব্দের পর মুস্‌লিম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিশেষ একটি রূপ নিয়ে হঠাৎ প্রকাশ পেয়েছিল, তা' স্থাপত্য-ইতিহাসের একটি বিশেষ ব্যাপার। তা'ছাড়া ইরাণের কাছা-কাছি অত বড় শক্তিশালী প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও বাই-জান্টাইন প্রভৃতি স্থাপত্যকলার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে যে তার একটি নিজস্ব রূপ দেখা দিয়েছিল, তা' ভাববার কথা। আরব জাতীয় লোকেরা ছিল হা-ঘরে এবং মরুভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত। তাই আদিমকালের আরব বা ইরাণীদের স্থাপত্যের কোনোই নিদর্শন নেই। এরই নিকটে মিসরে ও সিরিয়াতে যে স্থাপত্য বহু যুগ ধরে চলেছিল, তা'র কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই ইরাণী-মুস্‌লিম স্থাপত্যকলাকে 'সারাসানিক' (Sara-senic) বলা হয়। মুস্‌লিম ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই সারাসানিক স্থাপত্য নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা'র একটি বিশেষত্ব এই যে সেটি যে দেশে গেছে, সে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। তা'র প্রমাণ মিসর

উরোপের মুস্‌লিম-স্থাপত্য।

থেকে নিয়ে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আফ্রিকা, সিসিলি, ভারতবর্ষ স্পেন সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমান স্থাপত্য যেমন ভারতবর্ষের উত্তরে গান্ধার প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল, দেশের স্থাপত্যের সঙ্গে একেবারে মিশ খায় নি, তেমনি মুস্‌লিম-সারাসানিক স্থাপত্য-রীতি ভারতবর্ষে মোগলদের আমলে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল দেশের প্রাচীনতম কৃষ্টির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে। হ্যাভেল সাহেব এ বিষয় তাঁর ভারতীয় স্থাপত্যের (Indian Architecture) পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সারাসানিক স্থাপত্যের বিশেষত্ব হ'ল এই যে ঘরের মেঝে চৌকো হলেও ঘরের ছাদের মাঝখানে ব্রাকেট দিয়ে নানা প্রকারের গঠন দেয়: এবং সেই ছাদের উপরে (Ceilingএ) নানাপ্রকার আলঙ্কারিক নক্সায় সজ্জিত থাকে। যদিও প্রকৃতির হুবহু নকল করে ছবি বা মূর্ত্তি আঁকা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তবুও এই সব মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে নক্সাকারীর কাজের বিশেষ প্রচলন ছিল। আরব বা ইরাণী নক্সাগুলি প্রায় জ্যামিতিক নিয়মে রচিত হতো এবং তাই সকল প্রকার জ্যামিতিক রীতিতে আঁকা নক্সাকেই 'এ্যারাবাস্ক' (Arabesque) বলা হয়। এইরূপ প্রণালীতে তৈরী নক্সার জালি-কাজ সারাসানিক স্থাপত্যে খুব দেখা যায়। আরবী অক্ষরে ধর্ম্মপুস্তকের নানাপ্রকার 'বয়াৎ' চিত্র-বিচিত্র করে স্থাপত্য-সজ্জার জন্যে ব্যবহার করা হতো। মুস্‌লিম মেয়েদের পর্দ্দা থাকার জন্যে জালির কাজের খুবই রেওয়াজ ছিল।

প্রাচীন মুস্‌লিম স্থাপত্যের নিদর্শন সিরিয়াতে (Syria) অনেক পাওয়া যায়; কেননা সেখানেই প্রথম মুস্‌লিম ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। জেরুজিলাম (Jerusalem) খ্রীষ্টানদের

হাত থেকে খালিফ ওমার ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে দখল করে নিয়েছিলেন। সে সময়কার ছুটি ছোট ছোট মসজিদ এবং মেয়েদের বাসোপযোগী 'হারেম' আছে। এইখানে 'সাকরার' মসজিদটিতে বাইজান্টাইন শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। তখনো সারাসানিক স্থাপত্যের বিশেষ রূপটি ভাল করে ফুটে ওঠে নি। মুস্‌লিমদের পক্ষে এই মসজিদটি মক্কারই মত একটি বিশেষ পীঠস্থান। তা' ছাড়া 'এল্‌-আকসার' (El-aksah) মসজিদটিও প্রাচীন রোমান বাসিলিকা (Basilica) গির্জ্জার মত কতকটা দেখতে এবং খুব সম্ভব প্রাচীন গির্জ্জা ভেঙেই সেই মসজিদটি তখন তৈরী হয়েছিল। সিসিলি (Sicily) এবং স্পেনে (Spain) মুস্‌লিম স্থাপত্যের অনেক কিছু চিহ্ন আছে। আফ্রিকার উত্তর সীমান্তের মধ্যেও অনেক প্রাচীন মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। স্পেনে দীর্ঘ মুস্‌লিম অধিকারের সময় 'অল-হামবারার (Al-hambra) প্রাসাদ ও দুর্গ ১২৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। স্পেনের মুস্‌লিম স্থাপত্য সারাসানিক হলেও তা'র মধ্যে স্পেনের কৃষ্টিগত বিশিষ্টতা বজায় আছে। করদোভার (Cordova) মসজিদ এবং গিরালদার (Giralda) চৌকো মিনারটি খুব সূক্ষ্ম কারিগরিতে ভরা। ভারতবর্ষের মতই স্পেনের মুস্‌লিম স্থাপত্য সেখানকার একটি কৃষ্টিগত বিশেষ রূপ লাভ করেছিল।

আধুনিক যুগ।

আধুনিক যুগের উরোপীয় স্থাপত্যের ঢেউ এল আমেরিকার প্রধান রাজধানী 'নিউইয়র্ক' (New York) সহরের পঞ্চাশ-ষাট-তলা গগনভেদী বাড়ীগুলি থেকে। গথিক গির্জ্জার উঁচুদিকে ওঠার

ভাবটুকু মাত্র এই স্থাপত্যে আছে, কিন্তু তার কারিগরি কিছুই নেই। এই আকাশমুখী বাড়ীর মধ্যে বরং মিশরের সাধাসিধা ধরণ কতকটা পাওয়া যায়—যদিও হয়ত সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। এখনকার আবার অতি-আধুনিক স্থাপত্যের বিশেষত্ব হ'ল, তাতে কার্নিস বা কোনো অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি নেই। কখন কখন মনে হয় পরিকল্পনাগুলি প্যাকিংবাক্স সাজিয়ে রেখে করা হয়েছে। এরোপ্লেন ও বিদ্যুতের যুগে ক্রমশঃ স্থাপত্যকলা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, তা' বলা যায় না।

ভাস্কর্য্যকলা

স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্কর্য্যকলারও বিকাশ হয়েছিল মিসরে, এসিরিয়ায় এবং তার পরবর্ত্তী কালে গ্রীক-শিল্পের মধ্যে। ভারতের ন্যায় এই সব দেশেও স্থাপত্যেরই একটি অলঙ্কারস্বরূপে ভাস্কর্য্যকলার অভ্যুদয় হয়। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রধান ব্যবধান এই দেখা যায় যে মূর্ত্তি-গুলিকে স্থাপত্যের অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করলেও সে-গুলি যেন স্বতন্ত্রভাবে গড়া জিনিষ, কেবল কোনো প্রকারে স্থাপত্যের সঙ্গে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়। সেগুলিকে দেয়াল, থাম বা কার্নিস থেকে সরিয়ে রাখলে কোনোই ক্ষতি হয় না। অপর পক্ষে প্রাচ্য শিল্পীরা ভাস্কর্য্যকে স্থাপত্যের অলঙ্কারস্বরূপ এমনভাবে গড়ে তোলেন যে তার স্বতন্ত্র কোনোই অস্তিত্ব নেই।

উরোপের অতি আদিম যুগের ভাস্কর্য্যকলার পরিচয় পাওয়া যায় যখন উত্তর উরোপ একেবারে বার মাস তুষারাবৃত (Glacial period) থাকত—সেই যুগে। আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের তুষার (glacier) তখন ফরাসীদেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকত। সেই সময়কার আদিম মানুষের চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য্য-কলারও পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। বল্লমের দ্বারা শিকার করে তাঁরা প্রধানতঃ প্রাণধারণ করতেন এবং সেই কারণেই তাঁরা বল্লমের উপর নানাপ্রকার কারুকার্য্য করতেন। তাক্‌-দা-আঁদুবার্ট (Tuc d' Audoubert) গুহায় মাটির গড়া বাইসনের প্রতিমূর্ত্তিগুলি খুবই সুন্দর। ক্যাপ

ব্ল্যাঙ্কের (Cap Blanc) গুহার দেয়ালে খোদাই করা ঘোড়ার ছবিগুলি ৭ফুট ৭ইঞ্চি। ব্রুনিকেলের (Bruniquel) গুহার পাথরের উপর আঁচড় টেনে আঁকা ঘোড়ার ছবি ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার মাঝামাঝি একটি ব্যাপার। 'বাসেম্পোনীর' (Bassemponey) 'ভেনাস' নামে খ্যাত হাত-পা-মাথাশূন্য নারী-মূর্ত্তি এবং পরচুলা-পরা একটি নারীর মাথা সেই গুহায় পাওয়া গেছে। এইগুলি আদিম উরোপের ভাস্কর্য্যের বিশেষ পরিচয় দেয়। এগুলি ছাড়া বল্‌গা হরিণের (Reindeer) হাড়ের উপর গড়া তখনকার অনেক সুন্দর সুন্দর কাজের পরিচয় পাওয়া গেছে। সার্ডেনিয়া (Sardenia) দ্বীপে প্রাপ্ত তাঁবার প্রহরী-মূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি আদিম ভাস্কর্য্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

উরোপের আদিম সকলপ্রকারের শিল্পকলার গোড়ার ইতিহাসের সঙ্গে মিসরের শিল্পকলা জড়িত হয়ে আছে। তাই তা'রই কথা গোড়ায় বলতে হয়। আবার এই মিসরের বিষয় বলবার সঙ্গে সঙ্গে এসিয়া খণ্ডের মধ্যভাগের খুব প্রাচীন একটি রাজ্যের যা' খোঁজ পাওয়া গেছে, তা'র বিষয়ও বলা দরকার। সেই 'হিতাইতদের' (Hittites) মিসরের লোকেরা 'খাত্তি' (Khatti) বলত এবং নিনেভায় (Nineveh) ও কার্ণাকের (Karnak) মন্দিরে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণসাগরের (Black sea) কাছাকাছি সিরিয়ার (Syria) পার্ব্বত্য প্রদেশেই এদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁদের রাজধানী 'বোখাজ-কেউই'তে (Boqhaz Kewi) মাটি খুঁড়ে সম্প্রতি অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। হিতাইতদের ভাষা কতকটা ভারতীয়

এবং উরোপীয় (Indo-European) ধরণের বলে মনে হয়। এদের ভাস্কর্য্যকলার মধ্যে এসেরিয়া ও মিসরের ভাব আছে। এঁরাই এসিয়ামাইনরে এসেরিয়ার প্রতিপত্তির গতিরোধ করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানকার ভাস্কর্য্যকলার প্রতিকৃতিতে যেরূপ শিরস্ত্রাণ আছে, সেরূপ মিসর বা এসেরিয়ার কোন ভাস্কর্য্যের মধ্যেই পাওয়া যায় না। তাঁদের রাজধানীর তোরণ-দ্বারে সিংহ-মূর্ত্তি এবং দ্বারী প্রভৃতির ভাস্কর্য্য পাওয়া গেছে। থামের নীচেকার বৈঠকে স্ফিঙ্কসের (Sphinx) মুখ দেওয়া ডানাযুক্ত সিংহের দেহধারী মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। ভাস্কর্য্যকলায় যে তাঁদের বিশেষ দখল ছিল, তা' বেশ জানা যায়।

মিসরের ভাস্কর্য্য
খৃঃ পূঃ ৩০০০—

মিসরের ভাস্কর্য্যকলার মধ্যে বাস্তব ভাব বেশী না প্রকাশ পেলেও সেগুলি যে উপাদানে (Materials-এ) গড়া, তার বিশেষত্বের ভাবটিকে বেশ প্রকাশ করে। অর্থাৎ মূর্ত্তিটি পাথরের হ'লে পাথরের জড়-ভাবটির সঙ্গে ভাস্কর্য্যে গড়া মানুষের আকৃতির এমন একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করা হ'তো যে পাথরের পাথুরে ভাবটিও থাকে অথচ তা'রই মধ্যে মূর্ত্তিটির ভাবও বেশ ফুটে ওঠে। গ্রীক মূর্ত্তির সামনে দাঁড়ালে মূর্ত্তিটি এত প্রাণবন্ত বলে মনে হয় যে, সেটি যে পাথরের বা ব্রোঞ্জের তৈরী, সে-কথা সে সময়ে মনেই থাকে না। মিসরের মূর্ত্তিগুলি দেখলেই মনে হয় যেন মানুষের আকৃতিগুলি হঠাৎ পাথরের বা ব্রোঞ্জের মধ্যে জমাট বেঁধে গেছে। এঁদের ভাস্কর্য্যকলার মধ্যে আমরা এমন একটি সংযত ও সহজ ভাব পাই, যা'র মধ্যে বিরাট সৃষ্টির ভিতরকার সুষমা নিহিত

আছে। মূর্ত্তিগুলি দেখলে মনে হয় যে, এমন সহজ রেখা-বিন্যাস-দ্বারা খোদাই করা হয়েছে যে, পাথরের গা কেটে সেগুলিকে তৈয়ার করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি। মিসরের ভাস্কর্য্যের মধ্যে তা'ছাড়া একটি অনাবিল ছন্দ-গতি আছে, যা' অন্য কোনো ভাস্কর্য্যকলায় দেখা যায় না। এই সহজ কলা-সৌকুমার্য্য জগতের শিল্পকলায় একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে মিসরের ভাস্কর্য্যকে।

মিসরের প্রাচীনতম রাজ-বংশাবলীর যা' পরিচয় পাওয়া যায়, তা'রও আগেকার ভাস্কর্য্যের মধ্যে শ্লেট পাথরের ফলকের গায়ে সিংহ-শিকারের ছবি (relief) গড়া আছে। এর পরেই প্রথম পঙ্‌ক্তির রাজন্যদের গড়া পিরামিডের সংলগ্ন স্ফিঙ্কস্‌টি গ্রানাইট (Granite slab) পাথরের তৈরী। এটি যে ঠিক কার প্রতিকৃতি, তা' আজ পর্য্যন্ত জানা যায়নি। এই সময়কার ভাস্কর্য্যের মধ্যে মেন্‌খেরেসের (Mencheres) এবং তাঁর সহধর্ম্মিণীর যুগল মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাণী রাজাকে সাদরে দু-হাতে বাহু ও কোমর বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজার মুখ গম্ভীর, কর্ত্তব্যপরায়ণতার ভাবে সমুজ্জ্বল—রাণীর দিকে তাঁর যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন মন্দিরের গায়ে এইরূপ মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা রাজারাণীদের মূর্ত্তি বিরল নয়। পাণ্ডাকালের মল্লিকার্জ্জুনের মন্দিরে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ও তাঁর পত্নীর ত্রৈলোক্যমহাদেবীর মূর্ত্তি দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মিসরের আদিম পঙ্‌ক্তির রাজাদের সমসাময়িক ভাস্কর্য্য মেম্‌ফিসের (Memphis) পুরোহিতের মূর্ত্তিটিতে কোনো শিরস্ত্রাণ নেই, পরণে একটি কাপড় জড়ানো আছে

মাত্র। তা'ছাড়া সে সময়কার খেফ্রেনের (Chefren) বিরাট মূর্ত্তিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাথায় তা'র কাপড় জড়ানো কতকটা স্ফিঙ্কসের মত, কেবল তার একটি পরচুলা দাড়ি আঁটা আছে। মূর্ত্তিটি উঁচু কুর্সিতে বসা, ডান হাত মুঠো করে ডান দিকের জানুতে রাখা আছে, এবং বাঁ হাতটি বাঁ দিকের জানুর উপর উপুড় করে রাখা আছে। এই সময়কার তৈরী (প্রায় ৫০০০ বৎসরের) কাঠের একটি মূর্ত্তি কায়রোর যাতুঘরে রাখা আছে। তাতে নেড়ামাথা গোল চেহারার একটি লোক বাঁ পা বাড়িয়ে বাঁ হাতটিতে একটি লাঠি ধরে আছে। এটিকে কোনো একটি পিরামিডের স্থপতির প্রতি-মূর্ত্তি বলেই অনেকে অনুমান করেন।

প্রথম সেসোস্‌ট্রিসের পিরামিডের তলা থেকে তাঁর তু'রকমের মুকুট-পরা দাঁড়ানো প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। আদিম পঙ্‌ক্তির সকল ভাস্কর্য্য হয় নরম বেলে-পাথরে নয় তো কাঠে তৈরী হতো। মাসতাবার দেয়ালের ভাস্কর্য্যগুলি (relief) রঙ করা থাকত। রাজধানী 'মেমফিসে' (Memphis) যেমন মন্দির প্রভৃতির সঙ্গে ভাস্কর্য্যকলারও প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি থিবসের রাজধানীতে নবীন উদ্যমে শিল্পকলারও উন্নতি হয়েছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন যীশুখৃষ্টকে ভগবানের একমাত্র পুত্র বলে মনে করেন, তেমনি থেবাসের রাজাদের তখন স্বর্গের রাজা আম্মনের (Ammon) পুত্র বলে লোকে মনে করত এবং সেই কারণেই এত মন্দির ও এত মূর্ত্তি তাদের আমলে তৈরী হয়েছিল। প্রথম থিবসের যুগে (খৃঃ পূঃ ২০০০—১৫৮০) অসংখ্য ভাস্কর্য্যকলার আবির্ভাব হয়েছিল। এই সময়কার আস্ত পাথর কেটে তৈরী

বিরাট দু'টি ৬৫ ফুট উঁচু মূর্ত্তি মিসরের মরুকে আলোকিত করে আছে। এ দু'টি তৃতীয় আমেনোফিসের (Amenophis III) নিজের এবং তাঁর পত্নীর প্রতিকৃতি। সমসাময়িক মূর্ত্তিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় রামেসেসের (Rameses II) এবং তৃতীয় আমেন-হোটেপের (Amenhotep III) মূর্ত্তিগুলি খুবই সুন্দর। দের এল-ভাড়ীর (Der El-Bahri) জন্তুগুলির প্রতিকৃতি, বিশেষ গরুর প্রতিমূর্ত্তি, খুবই সুন্দর। প্রাচীন থেবান সর্দ্দারদের রাজত্ব কয়েক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত চলার পর বিদেশী হা-ঘরে হায়ক্সস্দের (রাখাল রাজার) রাজত্ব চলেছিল এবং এই হা-ঘরেদের পুনরায় তাড়িয়ে থোবান-রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন এ্যাশমেশ (Ashmes) রাজ। এই সময় আবার পুরো দমে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকলার উন্নতি হ'তে দেখা গেল। পাথরের মূর্ত্তিগুলিতে রঙ দিয়ে মিনাকারীর কাজ করা হ'তো। বিশেষ চোখের উপর রঙ দিয়ে এমন 'চান্‌কে' দেওয়া হ'তো—তাতে একটা জীবন্ত ভাব ভাস্কর্য্য-কলায় এনে দিত। মিসরের পিরামিডের গায়ে যে-সব ভাস্কর্য্য-চিত্র আছে, সেগুলি সবই সজ্জা-চিত্র এবং তা'র পরবর্ত্তী যুগের গ্রীক-শিল্পের মত তা'র কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

মিসরের ভাস্কর্য্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কাজের কথা বলব। নিউবিয়াতে (Nubia) আবু-সিম্বেলের (Abu-Simbel) চারটি সার সার বসা ৬০ ফুট উঁচু বিরাট প্রতিমূর্ত্তি মিসরের একটি প্রধান কীর্ত্তি। তা'রই নিকটে দেয়ালের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দাঁড়ানো কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। একটা স্তব্ধ গম্ভীর ভাব এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে

সর্ব্বদাই দেখা যায়। লাক্সারে (Luxor) পাহাড়ের দেয়ালের গায়ে দাঁড়ানো রাণী নেফারতারীর (Queen Nefertari) প্রতিমূর্ত্তিটি এবং ফারাও (Phraoh) আকেনাটনের (Akenaton) প্রতিকৃতি ছাড়াও অসংখ্য বর্ণনাযোগ্য ভাস্কর্য্যকলা মিসরে নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। একটি কথা প্রচলিত আছে যে, 'নাইল' নদীর ধার দিয়ে যতই চলে যাওয়া যায়, ততই যুগের পর যুগকে মাড়িয়ে চলা হয়। নাইল নদীর মোহানা থেকে আরম্ভ করে দু'ধারে পিরামিড, মন্দির ও ভাস্কর্য্যকলা দেখতে পাওয়া যায় এবং শেষে থেবাসদের যুগের কীর্ত্তির নিকট এসে একেবারে স্তম্ভিত হতে হয়। এখানে মহীশূরের নন্দী মন্দিরের আহ্নিক-রত চোল্‌রাজার প্রতিমূর্ত্তিটির সঙ্গে লুভে (Louvre) রক্ষিত প্রাচীন মিসরের লেখকের প্রতিমূর্ত্তিটির সাদৃশ্যের কথা বলতে চাই। এ দু'টি থেকে প্রমাণ এই হয় যে, সহজ ছন্দ প্রকৃতির মধ্যে যা' আছে, সেইটি ধরবার চেষ্টা এই দু'টি বিভিন্ন দেশের শিল্পীর মনের মধ্যে ছিল বলেই এইরূপ মিল দেখা গেছে। কোনো দেশের আদর্শের সঙ্গে অপর দেশের আদর্শগত মিল থাকলেই এইরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। মিসরের সকল মূর্ত্তিই 'অভঙ্গ' এবং আমাদের দেশের ভাস্কর্য্যকলায় দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ প্রভৃতি নানান ভঙ্গিমায় গড়া মূর্ত্তি দেখা যায়। উরোপের ভাস্কর্য্যকলা, মিসরের শিল্পের মধ্যে যে বাস্তব ভাবটি আছে, সেইটিকেই অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে বিষয় ক্রমশঃ বলা হবে। ক্রমশঃ এসেরিয়া ও গ্রীক-ভাস্কর্য্যের মধ্য দিয়ে রোমান-শিল্পে বাস্তবপ্রধান উরোপীয় শিল্প প্রসার পেয়েছিল।

মিসরের শিল্পীদের রচিত অনেকগুলি ব্রোঞ্জের ও কাঠের মূর্ত্তিও পাওয়া গেছে।

আসেরিয়ার ভাস্কর্য্য
খৃঃ পূঃ ৮৮৫—৬৬৯

ব্যাবিলোনিয়ায় (Babylonia) এবং নিনেভায় (Nineveh) আসুরদের (Assur) রাজধানী ছিল। নিনেভার প্রাসাদকে তখন 'সিংহাবাস' বলা হ'তো। নিনেভার নিকটেই 'খোরসাবাদে' সারগন (Sargon) প্রাসাদটির তোরণ-দ্বারে দু-পাশে দু'টি বিরাট ডানা দেওয়া সিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। আসুর নাজিরপাল (Assur Nazirpal), দ্বিতীয় শালমানেজের (Shalmanezer II), আসুর বাণীপাল (Asur Banipal) প্রভৃতির প্রাসাদাবলীতে এসেরিরার ভাস্কর্য্য-সম্পদের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। এদের সকল ভাস্কর্য্যের মধ্যে আসুর নাজিরপালের বিরাট মূর্ত্তিটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা' ছাড়া এঁদের আমলে মিসরের কারিগরদের মত পাথরের দেয়ালের গায়ে খোদাই করা চিত্রাবলীই (bas-relief) বেশী দেখতে পাওয়া যায়। পুরোপুরি মূর্ত্তি এঁরা খুব কমই গড়েছিলেন। প্রাসাদের সামনে মানুষ-মুখো বৃষ-আকারের প্রতিকৃতিও আছে। মিসরের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে এগুলির তুলনা করলে এইটুকুই তফাৎ মনে হয় যে মিসরের চেয়ে এগুলিতে যেন বেশ একটা জোরালো ভাব ও সুসামঞ্জস্য পরিস্ফুট হয়ে আছে। বেশীর ভাগ ভাস্কর্য্য-চিত্রে রাজাদের যুদ্ধের জয়-গাথার খবর পাথরের গায়ে বাটালি দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে। এগুলিতে মানুষের পৌরুষ-গর্ব্বের ভাব খুব বেশী ফুটে আছে বলে মনে হয়। মেয়েদের প্রতিকৃতি আসুরেরা খুব কমই গড়েছেন। মিসরের

কাজের মধ্যে যতটুকু বাস্তব ভাব পাওয়া যায়, এসেরিয়ার শিল্পীরা তার ধার দিয়েও যান নি। প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু পেয়েছেন, তা'রই একটি মন-গড়া রূপক-আকৃতি (conventional) তাঁ'রা নির্ভীকভাবে দিয়েছেন তাঁ'দের শিল্পকলায়। পশুপক্ষীর রূপক ছবিগুলি আসুরদের ভাস্কর্য্য-চিত্রে বেশ সুন্দর ফুটেছে।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত উইনকেলম্যানের (Winckelmann) লেখা "প্রাচীন শিল্পের ইতিহাস" পুস্তকে

গ্রীক-ভাস্কর্য্য খৃঃ পূঃ ৬০০—

গ্রীক-ভাস্কর্য্যের বিষয় বলা হয়েছে যে, সেগুলিকে বুঝতে হ'লে তা'র ভিতরকার উচ্চ আদর্শের (Ideal) বিষয় জানা দরকার। তিনি বলেন, সৌন্দর্য্য সাম্যের (unity) মধ্যেই আছে। একটি সুন্দর আকৃতির সাম্য তার প্রত্যেক টুক্‌রো টুক্‌রো অংশের সামঞ্জস্যের উপরই নির্ভর করে। এই সাম্য ও সামঞ্জস্যের ভাব এমন থাকবে যে তা' কেবল কোনো একটি বিশেষজ্ঞের ভাল লাগার উপর নির্ভর করবে না, জগতের সকল লোকেরই তা' ভাল লগিবে। যেমন বিশুদ্ধ জলের কোনো স্বাদ নেই, অথচ সকলেই সেটি গ্রহণ করে, সেইরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের কোনোই যোগ নেই। সেইজন্যেই তিনি অনুমান করেন গ্রীক পুরুষ ও মেয়ের মূর্ত্তিতে উভয় জাতির মধ্যে যে সব সামঞ্জস্যের বিশেষত্ব নিহিত আছে, সেইগুলিকে এক ছাঁচে ঢেলে তাঁরা এই সব মূর্ত্তিগুলি গড়ে গেছেন সকলের নয়নাভিরাম হবে ব'লে। অর্থাৎ মেয়ের মূর্ত্তিতে পুরুষের কতকগুলি ভাল গুণ যা' আছে আরোপ করেছেন, আবার পুরুষের মধ্যেও মহিলা

জনোচিত সৌন্দর্য্যের ছায়া আছে। উইনকেলম্যানের ব্যাখ্যা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, গ্রীক-ভাস্কর্য্য জগতের মধ্যে সহজবোধ্য এবং সর্ব্বজন-চিত্তরঞ্জক বাস্তব শিল্প। গ্রীক-শিল্প মিসর, এসেরিয়া, হিতাইত প্রভৃতি প্রাচীনতম শিল্প-কৃষ্টির ভিতর দিয়ে ক্রমশ ডোরিক (Doric), আইওনিক (Ionic) প্রভৃতির বাস্তব শিল্পকলার কোঠায় কি ভাবে যে এগিয়ে গিয়েছিল, তা'র সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। গ্রীক মূর্ত্তির ছন্দ-গতিটি তা'র কাপড় সাজানো ভাঁজগুলির সঙ্গে শরীরটিকে নিয়ে যেন চলেছে। যদিও খুবই এগুলি বাস্তব-ভাবাপন্ন, কিন্তু তা'রই মধ্যে সাজিয়ে তোলার (Conventional) ভাব খুবই পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলিতে রকমারি ভঙ্গীর (যদিও ভারতীয় শিল্পের মত বাঁধা-ধরা নয়) মধ্যেও একটি ঐক্য আছে, যা' দর্শকের মনে সহজেই আনন্দের উদ্রেক করে। গ্রীক-মূর্ত্তির বাস্তব-ভাবাপন্ন দেহ-পেশী-সংস্থানের মধ্যেও একটি ছন্দ-বিন্যাসের চেষ্টা নিহিত আছে।

গ্রীকদেশের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি বেশীর ভাগ পূজার জন্য তৈরী হ'তো। সব চেয়ে পুরাতন গ্রীক-মূর্ত্তি-প্রতিমা চেষ্ট-অব-সাইসেলাস্' (Chest of Cyselus) খৃষ্ট জন্মাবার ছয় শত-বৎসর পূর্ব্বের বলে জানা যায়। 'হেরা'র (Hera) মন্দিরে পেরিয়ান্ডের (Periander) সেটিকে উপহার দিয়েছিলেন। এই সব 'হেলেনিক' (Hellenic) ভাস্কর্য্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) মূর্ত্তির পায়ের দিকটা থামের মত এবং কখন কখন কাপড়ের ভাঁজ দিয়ে ঢাকা। মাথায় মিসরের

মূর্ত্তিগুলির মত শিরস্ত্রান পরা। লুভের (Louvre) যাহুঘরে হেরার (Hera) প্রতিমূর্ত্তিটি একটি ভাল দৃষ্টান্ত।

(২) মিসরের বসা বিরাট মূর্ত্তির মত ভারি প্রতিমা এবং কাপড়ের ভাঁজের আতিশয্য মণ্ডিত। ব্রান্চিদের (Branchidae) মন্দিরের নিষ্ঠুর 'মিলেটাসের' (Miletus) প্রতিমূর্ত্তিটিতে মিসরের ভাস্কর্য্যকলার প্রভাব বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

(৩) মানুষের বা স্থলচর জন্তুর প্রতিকৃতিতে ডানা দেওয়া।

(৪) ভাস্কর্য্য-চিত্র (Bas-relief) যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা-অবলম্বনে গড়া হ'তো।

(৫) নগ্ন পুরুষ-মূর্ত্তি। এগুলিতে মানুষের শারীর-তথ্যের (anatomy) বিষয় শিল্পীরা কতটা অভিজ্ঞ তা'র প্রচার করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'এ্যাপোলোর' (Apollo) প্রতি-মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ্যাপোলো বেল-ভেডিয়ার (Apollo Belvedere) যেটি ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে নেট্টুনোতে (Nettuno) আবিষ্কৃত হয়েছিল, এখন সেটি ভাটিকানে (Vatican) রাখা আছে। 'এ্যাপোলো' হলেন উদ্ধত যুদ্ধ-দেবতা। এর বাঁ হাতে একটি নরমুণ্ড ঝুলছে এবং পাশে গাছের গুড়ির উপর একটি সাপ জড়িয়ে আছে। এগুলিকে 'আর্কেয়িক'-সময়ের (Archaic Period) কাজ বলা হয়। এ্যাপোলোর মতই আবার ডায়না দেবীর (Diana) মূর্ত্তি আছে। ইনি হলেন ঠিক্ এ্যাপোলোর মতই শক্তিময়ী নারী-মূর্ত্তি। ইনি সকল মন্দকে দমন করেন এবং সকল সৌন্দর্য্যকে গড়ে তোলেন।

ইনি সকল দেবদেবীর রাণী—এঁকে গ্রীক 'শচী' বা 'ইন্দ্রাণী' বলা যেতে পারে। ডায়নার প্রতিমূর্ত্তি যেটি লুঁভের সংগ্রহে আছে, তাতে তিনি আততায়ী হরিণকে ব্যাধের হাত থেকে রক্ষা করছেন এবং তীরের আঘাতে হরিণ-হন্তাকে শাসন করছেন।

বিখ্যাত গ্রীক মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মার্সের (Mars) প্রতিমূর্ত্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রীক-প্রতিমূর্ত্তিতে শারীর-তথ্যের বিষয় এত দূর উৎকর্ষ হবার একটি প্রধান কারণ হ'ল তাঁদের তখনকার কালের পোষাক-পরিচ্ছদ। আধুনিক উরোপীয়দের মত তাঁরা তখন তাঁদের শরীর সম্পূর্ণ-ভাবে আবৃত রাখতেন না। তাঁদের 'টোগা' কতকটা আমাদের দেশের ধুতি চাদরের মত ছিল। তখনকার কালে তাই লোকেরা ব্যায়াম-চর্চ্চার দ্বারা শরীরের পেশীকে সুডৌল ও সুন্দর রাখতেন এবং সেই কারণেই সুন্দর শরীরের গঠন সম্বন্ধে সহজেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠতেন।

আমাদের দেশেও (বঙ্গদেশে) আধুনিক সভ্যতার পূর্ব্বে জামা বা কোর্ত্তা পরার রীতি ছিল না। তখন তাই সকলে শরীর-চর্চ্চার দিকে মন দিতেন। তাই খালি' গায়ে একখানি চাদর ঝুলিয়ে বেড়াতে কারুর লজ্জা বোধ হতো না—সুডৌল শরীর দেখবার ও দেখাবার সুযোগ হতো।

নারী-সৌন্দর্য্যের বাস্তব-ভাবের দিক থেকে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত মিলোর ভিনাসের (Venus of Milo) প্রতিমূর্ত্তিটি, এটিকে 'মেলো' (melos) দ্বীপে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পাওয়া যায় এবং তাই এই নামে তাকে অভিহিত করা হয়। এটি একটি জগৎ-বিখ্যাত নারী-মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির হাত দুটি ভেঙে গেলেও তার

বাস্তব-সৌন্দর্য্যের কোনোই অভাব হয়নি। এইখানেই শিল্পীর বিশেষত্ব। হয়ত হাত-পা কাটা জীবন্ত একটি সুন্দরীকে দেখলে লোকে আঁৎকে উঠ্‌বে, কিন্তু এই ভাঙা মূর্ত্তিটির অঙ্গহানি হলেও কারুর মনে তার বিকলাঙ্গের কুৎসিৎ ভাব জাগে না। নগ্ন মূর্ত্তি হলেও এটির সামনে দাঁড়ালে মনকে একটি অলৌকিক যায়গায় নিয়ে যায়। এথেন্সের (Athens) নিকটস্থ একটি পর্ব্বতের উপর পার্থিননের (Parthenon) ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক-ভাস্কর্য্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। ভগ্ন মন্দিরটি ফেইডিয়াস (Pheidias) এবং তাঁর সহকর্ম্মী শিল্পীদের রচিত ভাস্কর্য্যকলায় মণ্ডিত আছে। মন্দিরের মধ্যে একটি ৪০ ফুট উঁচু বিরাট মিনার্ভার (Minerva) দেবীর মূর্ত্তি আছে। তাঁর মাথায় ঝড়-ঝঞ্ঝার (Aegis) প্রতীক এবং তাঁর এক হাতে ঢাল ও অপর হাতে বিজয়লক্ষ্মীর (Victory) একটি ছোট্ট প্রতিমূর্ত্তি আছে। গ্রীক মহিলা প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে লুঁভে (Louvre) রক্ষিত 'বিজয়লক্ষ্মী' (Victory) মূর্ত্তিটির মাথা না থাকলেও খুবই উচ্চ আদর্শের। এগুলি ছাড়া হেরকিউলেস্ (Hercules), এ্যামাজন (Amazon), সুষুপ্ত আরিয়াদ্‌নে (Slee-

---

(১) হেরাকউলেস্ :—একজন আদর্শ বীর। তাঁকে শক্তির দেবতা বলা হতো। অমরত্ব-লাভের জন্য ইন্দ্রাণী 'হেরা' বা 'জুনোর' নিকট ১২টা অসীম বীরত্বসূচক কাজ তাঁকে করে দেখাতে হয়েছিল।

(২) এ্যামাজন :—একটি মেয়েদের পরিচালিত রাজ্য। কৃষ্ণ-সাগরের (Black Sea) নিকটে ককেসাস (Caucasus) পর্ব্বতের উপর তাঁদের রাজ্য ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ করাই ছিল তাঁদের কাজ। মাঝে মাঝে তাঁরা গ্রীক সম্রাজ্যে ভিতর ঢুকে তাঁদের শান্তি ভঙ্গ করতেন।

(৩) আরিআদ্‌নে :—ক্রীটের (Crete) রাজা মিনোসের

ping Ariadne) সিংহ ও ডায়োনিসাস (Dionysus and Lion) প্রভৃতি অসংখ্য প্রতিমূৰ্ত্তি গ্রীক ভাস্কর্য্যকলাকে অলঙ্কৃত ক'রে রেখেছে।

গ্রীক মূৰ্ত্তিগুলিকে জানতে হলে গ্রীক পুরাণের সকল কাহিনী ভাল করে জানতে হয়। ভারত শিল্পের মত গ্রীক-শিল্পকলা ধৰ্ম্ম-সাধনাকে অবলম্বন করেই প্রধানতঃ গড়ে উঠেছিল। নানা প্রকারের প্রতীক চিহ্ন (Symbols) তাই গ্রীক শিল্পে দেখা যায়। 'দেমেতের' (Demeter) হলেন ধরণী-মাতা, 'ফ্লোরা' (Flora) হলেন অরণ্যানীর জননী। 'নেরেয়াস' (Nereus) এবং তাঁর কন্যারা সমুদ্রের দেবী। 'গ্লাউকস' (Glaucus) এবং 'সিরিণ' (Sirens) সমুদ্রের উপদেবতা। এঁরা সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তিতে সমুদ্রযাত্রীদের অভিভূত ক'রে ফেলতেন এবং তাঁদের সর্ব্বনাশ করতেন। এই সিরিণদের সঙ্গীতকেও উপেক্ষা ক'রে ওডিসিউস্ (Odysseus) জাহাজে চড়ে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীর কাণে মোম ভ'রে দিয়েছিলেন এবং নিজেকে তিনি তাঁর জাহাজের মাস্তুলে বেঁধে রেখেছিলেন। এই গল্পটি অবলম্বন করে তখনকার অনেক গ্রীক কবি কাব্য-রচনা করে গেছেন। 'সাটায়ার' (Satyr) হলেন প্রকৃতির প্রাণ-স্বরূপ (Spirit of Nature)। সাটায়ারের ভাব হ'ল অনেকটা দুষ্টু আত্মার মত। গ্রীক শিল্পীরা এই সাটায়ারের

(Minos) কন্যা। ইনি থেসেউস্‌কে (Theseus) ইঙ্গিত-দ্বারা পথ বলে দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

(৪) ডায়োনিসাস্—ইনি গ্রীক মাদকতার দেবতা। রোমান প্রতিশব্দ 'বাকাস' (Bachus)।

নানা প্রকার রূপ ও প্রতিমূর্ত্তি গড়েছিলেন। গ্রীক পুরাণে মৃত্যু ও সুষুপ্তিকে দুটি ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এঁদের জনক হ'লেন রাত্রি। মৃত্যু ও সুষুপ্তির বাসা হ'ল পাতালে এবং যখন তারা পৃথিবীতে আসে তখন নশ্বর দেহকে নিয়ে যায়। সুষুপ্তির দয়া আছে, আবার তাকে ফিরিয়ে দেয়; কিন্তু মৃত্যুর দয়া-মায়া নেই—একেবারেই নিয়ে চলে যায়। এইরূপ অসংখ্য উপকথা ও পৌরাণিক গাথার ভিত্তির উপর গ্রীক-ভাস্কর্য্যকলা দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সময় আসল দেবতাকে ছেড়ে তাঁর বাহনের পূজার ধূম চলতো। ইটালীতে তাই এখনো দেখা যায় সাধারণের মধ্যে জগদীশ্বরের চেয়ে সাধু-মহাত্মার (Patron Saints) পূজার চলন খুব বেশী আছে।

গ্রীক পৌরাণিক দেবতাদের একটি তালিকা দেওয়া গেল যাঁদের প্রতিমূর্ত্তি গ'ড়ে ভাস্করেরা ধন্য হয়েছেন ঃ—(১) জুপিটার (Jupiter) স্বর্গের অধীশ্বর। (২) জুনো (Juno) তাঁর পত্নী—শচী দেবী। এঁদের আবার আটটি পুত্র কন্যা। যথা ঃ—(৩) মিনার্ভা (Minerva), (৪) মার্স (Mars), (৫) ভল্‌কান (Vulcan), (৬) এ্যাপোলো (Apollo), (৭) ডায়না (Diana), (৮) ভিনাস (Venus), (৯) মারকারী (Mercury), (১০) ভেস্‌তা (Vesta)। পৌরাণিক গল্পগুলির মধ্যে মারকারীর গল্পটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বলে এখানে উল্লেখ করছি।

হারমেস (Hermes) অর্থাৎ 'মারকারী' জন্মেছিলেন পার্ব্বত্য প্রদেশে অন্ধকার গুহায় এবং ইনিই ছিলেন জুপিটার ও জুনোর (ইন্দ্র ও শচীর) সব চেয়ে অধম সন্তান। জন্মাবার

পর যখন গুহায় শুইয়ে রেখে তাঁর মা অন্যত্র চলে গেছেন, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হ'তেই শিশু 'মারকারী' দেখতে পেলেন গুহার সামনেই একদল গরু চরছে। গরুগুলি ছিল তাঁর বড় ভাই 'এ্যাপোলোর', কিন্তু তিনি গরু চুরির লোভ সামলাতে কিছুতেই পারলেন না। কতকগুলি গরু চুরি করে লুকিয়ে রেখে এসে পুনরায় আপনার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এদিকে যারা তাঁকে চুরি করতে দেখেছিল, তারা গিয়ে এ্যাপোলোকে সব কথা বলে দিলে। এ্যাপোলো জেউস (Zeus) অর্থাৎ জুপিটারের (ইন্দ্রের) দরবারে নালিশ করলেন। মারকারীর বয়স তখন মাত্র একদিন। কিন্তু দরবারে যাবার আগে একটি কচ্ছপ দেখে তাঁর বুদ্ধি খুলে গেল—তা'র খোলসটাতে ফুটো ক'রে তার বসিয়ে একটি বাদ্যযন্ত্র (Lyre) তৈরী করবার। সেই বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে জুপিটারের দরবারে তিনি উপস্থিত হলেন। সেই বাদ্য শুনে দেবরাজ জুপিটর এবং সভাসদ সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পিতার সামনে সেই বাদ্যযন্ত্রটি ভাইকে উপহার দিতেই মামলা মিটমাট হয়ে গেল।

দেবতাদের মূর্ত্তি ছাড়াও তখনকার গ্রীক যোদ্ধা ও বীর-পুরুষদের মূর্ত্তি-গড়ারও প্রচলন ছিল। সক্রেটিসের (Socrates) এবং পেরিক্লেসের (Pericles) সময় এইরূপ বড় বড় নায়ক অধিনায়কদের মূর্ত্তি গড়া হতো। মাইরণের (Myron) খৃঃ পূঃ ৫৫০-১৪০ খ্রীষ্টাব্দের গড়া, ফেইডিয়াসের (Pheidias) খৃঃ পূঃ ৫০০-৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের এবং পলিক্লেইতসের (Polycleitus) খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগের গড়া মূর্ত্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে 'এ্যাটিক স্কুলের'

(Attic school) কাজ বলা হয়। মাইরণের গড়া মূর্ত্তি-গুলির মধ্যে ডিস্‌কোবোলাসের (Discobolus) মূর্ত্তিটিতে তিনি সচলতার ভাব যা' ফুটিয়ে তুলেছেন, তা' অন্যান্য ভাস্করেরা কখনই পারেন নি। মাইরণ ছিলেন প্রথমে একজন ঢালাইকর এবং পরে তিনি ঢালাইয়ের কাজ ছেড়ে মূর্ত্তি-গড়ায় মন দিয়েছিলেন। মাইরণের মূর্ত্তির সচলতার বিষয় একজন লেখক বলেছেন, "মূর্ত্তিটির হৃদয় যেন আশায় পরিপূর্ণ আর তার শ্বাস যেন ঠোঁটের উপর রয়েছে···ব্রঞ্জের মূর্ত্তিটি নিশ্চয় তার পায়দান থেকে ঝাঁপিয়ে গোলের উপর এসে পড়বে। ("He is filled with hope and you may see the breath caught on his lips······surely the bronze will leave the pedestal and leap to the goal") উল্লিখিত গ্রীক শিল্পীদের সময়কার শ্রেষ্ঠ কাজের নিদর্শণ 'বিজয়লক্ষ্মী' (The Victory) বল্লমধারী (The Spear-Bearer) মল্ল (Athlete) প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলিতে পাওয়া যায়। 'স্কোপাসকে' (Scopus) গ্রীক-মাইকেল আঞ্জিলো বলা হয়। স্কোপাসের (Scopus) খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর কাজ যদিও কতকটা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী পলিক্লেইতসের মত, এঁর কাজের মধ্যে বেশ একটু মেয়েলি সৌকুমার্য্যের ভাব বেশী পাওয়া যায়। এঁরই সমসাময়িক খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর শিল্পীদের মধ্যে প্রাক্সিটেলেসের (Praxiteles) (খ্রীঃ পূঃ ৩৯০-৩২২) তৈরী—এ্যাফ্রোডাইটের (Aphrodite) দেবী-মূর্ত্তিটি তখনকার সময়কার একটি ভাল কাজ। এটিকে গ্রীসের নিকটস্থ 'কস্‌' (Cos) দ্বীপের অধিবাসীরা নগ্নতার জন্যে প্রথমে গ্রহণ না করায় 'কুইডাস' (Cuidus) দ্বীপের

লোকেরা নিয়ে রেখেছিলেন। পরে বিথিনিয়ার (Bithynia) রাজা প্রজাদের ঋণ রাজকোষ থেকে সব শোধ করে দেওয়ায় তার বদলে প্রজাদের কাছ থেকে তিনি এই এ্যাফ্রোডাইটের দেবীমূর্ত্তিটি উপহার পেয়েছিলেন। কুইডান দ্বীপের প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রায় এ্যাফ্রোডাইটের মূর্ত্তিটি উৎকীর্ণ করা আছে। প্রাক্সিটেলাসের তৈরী হেরমেস (Hermes), ইরোস (Eros) এবং মর্ম্মর-রচিত 'ফণ' (The Marble Faun) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রবল প্রতাপান্বিত অ্যালেকজাণ্ডারের (Alexander the Great) সময়কার বিখ্যাত ভাস্কর ছিলেন 'লিসিপাস' (Lysippus—খৃঃ পূঃ ৩৭২-৩১৬)। তিনি শিল্পকলার একটি নূতন দিক দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস্কর পলিক্লেইতসের মত বাস্তবপন্থী হ'লেও তাঁর কাজে বেশ একটু বিশেষত্ব ফুটে উঠেছিল। তাঁর মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি অতিমানুষিক ভাব আছে। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক মাপ প্রমাণের সাধারণ হিসাব উপেক্ষা ক'রে তিনি হাত, পা, মাথা, আঙুল প্রভৃতি শরীরের সকল প্রান্তভাগকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকার দিয়ে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলতেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত এই প্রতিমা-মান-লক্ষণই পরবর্ত্তী সকল গ্রীক ভাস্করেরা মেনে নিয়েছিলেন। জগৎ-বিখ্যাত শিল্পী মাইকেল আঞ্জিলো তাঁর গড়া সকল মূর্ত্তিরই মান-প্রমাণ এই নিয়মেই গড়েছিলেন। 'লিসিপাস' যখনই কোনো নূতন কাজে হাত দিতেন, তখনই একটি করে পয়সা বাক্সের মধ্যে তুলে রাখতেন। তাঁর গচ্ছিত তহবিল গুণে জানা গেছে যে তিনি পনেরোশো মূর্ত্তি গড়েছিলেন। তাঁর গড়া 'বিশ্রামরত হেরমেস' (Resting

Hermes) 'বসা হেরাক্লেস্' (Seated Heracles) প্রভৃতি অসংখ্য ভাল ভাল মূর্ত্তি আছে। এঁর গড়া সম্রাট অ্যালেকজাণ্ডারের মূর্ত্তিটি বিখ্যাত।

অ্যালেকজাণ্ডারের সময় তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় (Alexandria) একটি শিল্প ও সাহিত্যের পীঠস্থান হ'য়ে উঠেছিল। গ্রীক বাস্তব-শিল্পের প্রভাবে মিসরের স্বাতন্ত্র-ভাব আর রইল না। মিসরের শিল্পীরাও শেষে গ্রীকদের নকলে নানাপ্রকার মূর্ত্তি গড়তে আরম্ভ করলেন। তবে তাঁদের এই উদ্যম সফলতামণ্ডিত হ'তে পারেনি। এই দৃষ্টান্ত থেকে বেশ প্রমাণিত হয় যে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর না দাঁড়িয়ে অপর দেশের শিল্পের নকলে কোনো দেশের শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। মিসরের এই সময়কার গ্রীকদের নকলে গড়া অপটুত্বের দৃষ্টান্ত ভাস্কর্য্যকলায় ভূরি ভূরি দেখতে পাওয়া যায়। রোডসের (Rhodes) ভাস্কর্য্যকলাই গ্রীক-শিল্পীদের শেষ শিল্প-অনুষ্ঠান। এদের কাজের মধ্যে 'মরণোন্মুখ অ্যালেকজাণ্ডারের' (Dying Alexander) প্রতিকৃতি, 'এ্যাপোলো বেলভেডিয়ার' (Apollo Belvedere), 'মৃত্যুমুখে গ্লাডিয়েটার' (Dying Gladiator), 'লাওকোওন্' (Laocoon) প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'লাওকোওন্' ছিলেন 'নেপচুন' (Neptune) দেবতার পূজারী। ট্রোজানের (Trojan) যুদ্ধের সময় ট্রয় (Troy) নগরীর প্রাচীরের বাইরে *শত্রু-পক্ষ গ্রীকেরা একটি কাঠের ঘোড়া স্থাপন ক'রে* রেখেছিলেন। তার মধ্যে তাঁদের সৈন্য লুকানো ছিল। ট্রয়ের লোকেরা ভাবলেন ভাগ্যদেবী মিনার্ভার ভক্ত গ্রীকেরা ঐ কাঠের ঘোড়াটি দেবীকে নিবেদন করেছেন মাত্র।

'লাওকোওন্' তখন নেপচুনের মন্দির থেকে দুটি পুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং ট্রয়বাসীদের চীৎকার করে ডেকে সাবধান করে দিলেন যে ঐ ঘোড়াটি স্থাপন করা গ্রীকদের একটি দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। হঠাৎ ঠিক্ সেই সময় দুটি অজগর সাপ বেরিয়ে এসে 'লাওকোওন' এবং তাঁর পুত্র দুটিকে গ্রাস করতে গেল। সবাই বল্লে দেবতার কাছে মানতের ঘোড়াকে উপেক্ষা ও অপমান করায় বিধাতা 'লাওকোওন'কে এই সাজা দিয়েছেন। কিন্তু ঠিক্ 'লাওকো-ওনের' কথাই খাট্‌ল। রাত্রে চুপি চুপি গ্রীক সৈন্যেরা কাঠের ঘোড়ার পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ট্রয়নগরী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিলে—মানুষ, ঘর, বাড়া কিছুরই আর চিহ্নমাত্র রইল না!

রোমান যুগের ভাস্কর্য্যকলা

ইতালী ও গ্রীসের সেই সময় আবার হেলেনিসটিক্ (Hellenistic) শিল্পীদের মধ্যে 'এট্রুসকান আর্টের' (Etruscan Art) আবির্ভাব হয়েছিল। এই সময় শিল্পকলার ভিতর একটা দুর্ব্বলতা দেখা দিয়েছিল। তখনকার শিল্পীরা বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন নি, গতানুগতিকতায় পঙ্গু ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। এর ঠিক পরেই আবার 'মরণাপন্ন গল' (Dying Gaul) 'ধর্ম্মের ষাঁড়' (Farnese Bull) প্রভৃতি সুন্দর ভাস্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক হ'লেও এগুলির রোমান প্রজাতন্ত্রযুগে ইটালীতেই আবির্ভাব হ'য়েছিল। রোমান বীরেরা গ্রীসে করিন্থ (Corinth) লুট করার পর যখন শিল্প-সম্ভার ইটালীতে বহন করে নিয়ে গেলেন, সেই থেকেই গ্রীসের শিল্পকলা রোমান-রাজ্যে একটি বিশেষ 'ফ্যাসানে' পরিণত হয়ে গেল এবং সেই

কারণেই তখনকার সকল ভাস্কর্য্যকলাকেই গ্রীক-ভাবাপন্ন দেখা যায়। গ্রীক সংস্কার, গ্রীক শিল্প ও গ্রাক সাহিত্য সে সময় উরোপে সর্ব্বত্রই আদৃত হয়েছিল। তার নজির উরোপে সর্ব্বত্র এখনো বর্ত্তমান আছে। অ্যালেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে উরোপ ছাড়াও এসিয়া খণ্ডের নানা স্থানে—এমন কি ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তক্ষশীলার গান্ধার-শিল্প তার বিশেষ একটি নজির।

.প্রতিকৃতি গড়ার দুইটি বিশেষ ধারা আছে। একটি হ'ল মানুষের চেহারার মধ্যে দোষ গুণ যাই থাক না কেন অবিকল তার নকল করা, তাকে বলে বাস্তব (Realist) শিল্পীর কাজ এবং অপরটি হ'ল চেহারার কেবল বিশেষত্বটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা, তাকে বলে আদর্শবাদী (Idealist) শিল্পীর কাজ। রোমানেরা তাঁদের 'ফোরামে' (Forum) পূর্ব্বপুরুষদের অসংখ্য প্রতিকৃতি রেখে গেছেন। এঁদের কাজ গ্রীকদের মত আদর্শবাদীর কাজ নয়, এঁরা ছিলেন 'বাস্তব-পন্থী'। সম্রাট হাড্রিয়ানের (Hadrian) প্রিয় সহচর এ্যান্‌টিনোয়াসের (Antinous) প্রতিকৃতি খুব সুন্দর এবং বাস্তব-পন্থীদের কাজের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এ্যান্‌টিনোয়াসকে সম্রাট তাঁর এসিয়া-মাইনর অভিযানের পথে দেখতে পান এবং তাঁর যৌবন-দীপ্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন। তিনি তাঁকে পার্শ্বচর করে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এ্যান্‌টিনোয়াস সম্রাটের সঙ্গে এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাণ, মিসর প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করেন। মিসর-ভ্রমণ-কালে নাইল নদীতে নৌকায় চড়ে সম্রাটের সঙ্গে বেসাতে (Besa) পৌঁছবার সময় সুন্দর যুবক এ্যানটিনোয়াস দৈবাৎ জল-মগ্ন

হ'য়ে মারা যান। এঁর প্রতিকৃতিটি তখনকার শিল্পীদের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

স্থাপত্যকলার বর্ণনাকালে পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে রোমান-সম্রাট্ নার্ভার (Nerva) পোষ্যপুত্র ত্রোজানের জয়-তোরণ ও স্তম্ভের কারিগরির কথা বলা হ'য়েছে। ভাস্কর্য্য-কলার নজির হিসাবে এই দুই স্থাপত্য কলায় যে-সব ভাস্কর্য্য-চিত্র জড়ানো আছে, সেগুলি ইউরোপের শিল্প-জগতের গৌরব-বিশেষ। এগুলি দেখে কবি দান্তে, র‍্যাফেল, মাইকেল আঞ্জিলো প্রভৃতি বড় বড় শিল্পী ও কবি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। ত্রোজানের জয়-স্তম্ভের বেদিকাটির চার পাশে দাসিয়ান (Dacians) এবং পার্থিয়ানদের (Parthians) সঙ্গে সম্রাট ত্রোজানের যুদ্ধাভিযানের সকল ঘটনাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাস্কর্য্য-চিত্রে বিবৃত করা হ'য়েছে। যদিও স্তম্ভটির গঠনের মধ্যে কোনই সৌন্দর্য্য বা বিশেষত্ব নেই কিন্তু ভাস্কর্য্য-চিত্রে সেটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাইকেল আঞ্জিলো বলেছিলেন যে, যদি ত্রোজানের কীর্ত্তিগুলি না থাকত তো ভিনিসিয়ানদের (Venetians) শিল্পকলা আজ কখনই এত উচ্চ-শিখরে গিয়ে পৌঁছত না। প্রাচীন ভাস্কর্য্য-কলার উন্নতির শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল ত্রোজানের এই ভাস্কর্য্যগুলি।

রোমান শিল্পের অধঃপতন হ'ল কন্সটানটাইনের (Constantine) রাজত্বকালে। খৃষ্টধর্ম্মে মূর্ত্তি-পূজা নিষেধ থাকায় তাঁরা আর ভাস্কর্য্যকলার দিকে কিছুকাল মন দিলেন না। এরই পরে 'গথিক' (Gothic) স্থাপত্য-কলার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন করে ভাস্কর্য্যকলার প্রচার হ'ল

রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দ্বারা। কিন্তু ভাস্কর্য্য-কলা আর স্বতন্ত্রভাবে পুষ্ট হ'ল না, গির্জ্জা ঘরেরই সামিল হ'য়ে রইল। ভার্জ্জিন মেরী ও খৃষ্টের মূর্ত্তি প্রাচীন রোমান দেবদেবীর স্থান অধিকার করলেও তার সেই দেবোপম ভাব দিয়ে আর সেগুলি গড়া হ'ল না। ভার্জ্জিন মেরীকে মানব-জননী আকারে এবং খৃষ্টকে একজন ইহুদী-জাতির লোক হিসাবেই গড়া হ'ল। প্রাচীন গ্রীক শিল্পের কৃষ্টির সঙ্গে সংস্কারগত যোগ নাম মাত্র রয়ে গেল। রোমানাস্ক খৃষ্টিয় ভাস্কর্য্যের দৃষ্টান্ত আর্লসের (Arles) গির্জ্জায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। গির্জ্জাটির স্তম্ভের গায়ে সার সার সাধু-মহন্তদের (saints) ভাস্কর্য্য-মূর্ত্তি যে ভাবে সজ্জিত আছে সেগুলি দেখলেই আমাদের দেশে দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের ভিতরকার অলিন্দের ভাস্কর্য্যের কথা মনে আসে। আমিনের গির্জ্জার (Amien Cathedral), নোতর-দামের (Notre-Dame) গির্জ্জার সকল মূর্ত্তিই 'গথিক' শিল্পের বিশেষ আদর্শ। নবম লুইয়ের (Louis IX) প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট ডেনিসের (St. Denis) গির্জ্জায় অসংখ্য ভাস্কর্য্যচিত্র আছে। উরোপের নানা স্থানে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অসংখ্য গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়কার 'ডচ' শিল্পী 'নিকোলাস স্লুইটার' (Nicolas Sluyter) এবং তাঁর ভাগ্নেদের কাজ 'দীজনের' (Dijon) গির্জ্জাটিকে আজ পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত করে রেখেছে। এই সকল গির্জ্জার নক্সাকারী কাজের মধ্যে মিসরের, রোমান ও ইরাণী নক্সার প্রভাব যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। রোমান শিল্পীদের তৈরী পোড়া মাটির (Terra-cotta) ছোট ছোট প্রতিমূর্ত্তি ট্যানাগ্রা

(Tanagra) প্রদেশে (ইটালীতে) পাওয়া যায়। তা'ছাড়া এই সময় গির্জ্জা প্রভৃতিতে রঙিন কাচের ছবি জানালার উপর গড়ার (Stained Glass) প্রচলন হয়। গির্জ্জার জন্যে ভাল ভাল ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগীর প্রভৃতি কারুশিল্পেরও উন্নতি এই সময় হ'য়েছিল।

ইটালীর নব-অভ্যুদয়ের যুগের (Renaissance Period) কথা বলতে গেলে গোড়াতেই ভাস্কর নিকোলো পিসানোর (Niccolo Pisano) নাম করতে হয়। আঁদ্রী (Andrea), গিওভানি পিসানো (Giovanni Pisano), গিওত্তো (Giotto) প্রভৃতি বড় বড় শিল্পীদের কথা বলা দরকার।

ইটালীর
নব অভ্যুদয়ের যুগ
১৪৭৫ খৃঃ আরম্ভ

এই সময় আবার মাইকেল আঞ্জিলো (Michelangelo) একসঙ্গে তুলি আর ছেনি ধরে এই যুগের ভাস্কর্য্য ও চিত্র-কলাতে এক নবজীবন এনে ফেলেছিলেন। এঁর গড়া 'পায়েটা' (Pieta), 'টনডো' (Tondo), 'ডেভিড' (David), মোজিস্ (Moses) প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলি জগৎ-বিখ্যাত। ফ্লোরেন-টাইন কর্ত্তৃপক্ষের জন্যে এই ডেভিডের বিরাট মূর্ত্তিটি তিনি গড়েছিলেন। যে বিরাট পাথরের উপর তিনি এই মূর্ত্তিটি গড়েছিলেন, সেটি সেখানে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো শিল্পী মূর্ত্তি গড়বেন বলে আনিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মাইকেল আঞ্জিলোই সেই পাথরটিকে কেটে মূর্ত্তি গড়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। সে সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দু জন শিল্পী ছিলেন —'পিত্রো তোরিজিয়ানি' (Pietro Torrigiani) এবং বাসিও বান্দিনেলী (Baccio Bandinelli)। এঁরা দু' জনে তাঁর প্রতিভায় এবং সম্মানে এত ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়েছিলেন যে

একদিন ছুঁতো করে মাইকেল আঞ্জিলোর সঙ্গে তাঁরা ঝগড়া বাধিয়ে দেন এবং তাঁর নাকে ঘুসি মেরে নাক ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। মাইকেল আঞ্জিলোকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তাঁরা পরাস্ত করলেন বটে কিন্তু তাঁর প্রতিভাকে তাঁরা খর্ব্ব করতে পারলেন না। অবশেষে তাঁরা দু' জনে লজ্জায় ও কষ্টে দেশত্যাগী হলেন। ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবিতে (Westminster Abbey) সপ্তম হেনরীর মনুমেণ্টে মাইকেল আঞ্জিলোর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একজনকার কাজ আছে। সেলেনি (Cellini), গিওভানি আঞ্জিলো (Giovanni Angelo), জঁা বোলেঁা (Jean Boulogne) প্রভৃতি সকল শিল্পীর মধ্যেই মাইকেল আঞ্জিলোর প্রভাব দেখা যায়। মাইকেল আঞ্জিলোর পরবর্ত্তী শিল্পীদের মধ্যে বেরনিনি (Bernini) বেশ নাম করেছিলেন সে সময়। তাঁর প্রতিষ্ঠার কথা জানতে পেরে সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই (Louis XIV) লুভের (Louvre) প্রাসাদের পূর্ব্বায়তনটিতে ভাস্কর্য্য সজ্জার জন্যে ইটালী থেকে তাঁকে প্যারিসে আনিয়েছিলেন। বেরনেনি ফরাসী ভাস্করদের হাতে সে কাজের ভার দিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ইনি প্রাচীনকালের শিল্পীদের কাজের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার অনুশীলন করতেন। তাঁর কাজের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় ঐতিহ্যের মিলনে একটি বেশ বোনেদি শিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল। ষ্টিফুনো মেডেরনা (Stefuno Maderna) এবং এ্যাবসানড্রো আলগার্ত্তি (Abssandro Algardi) এই দু' জন বেরনেনির সমকক্ষ ভাস্কর ছিলেন। মহামান্য পোপ লিওর (Pope Leo the Great) গির্জ্জার বেদীর

উপর ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলি (Bas-relief) এঁদেরই দ্বারা করিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালীর ভাস্কর্য্যের অধঃপতন প্রথমে আরম্ভ হয়। এ্যানটনিও ক্যানোভার (Antonio Canova) ১৭০টি মূর্ত্তির মধ্যে কোনোটির ভিতরেই শিল্পকলার উচ্চ আদর্শকে রক্ষা করা হয়নি। এগুলিকে কেবল সুন্দর করে গড়বারই চেষ্টা করা হ'য়েছিল সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করার জন্যে। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনো 'রস' বা 'প্রাণ' নেই। এর ঠিক পরেই আবার এইরূপ জন-মনের প্রীতির কথা ভুলে গিয়ে আর একটি শিল্প-ধারার প্রবর্ত্তন করেছিলেন স্বনামধন্য শিল্পী লরেঞ্জো বার্ত্তোলিন (Lorenzo Bartolin—১৭৭৭—১৮৫০)। ফ্লোরেন্সের নিকটেই এঁর জন্ম। ইনি ছিলেন একজন কামারের ছেলে। এঁর কাজের চেয়েও এঁর তুটি শিষ্যের কাজ আরো বেশী পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল গুণি-সমাজের কাছে। এই সময় গিওভানি ডুপ্রে (Giovanni Dupre) মারোকেটি (Marochetti) এবং ভিন্‌সেন্‌জো ভেলা (Vincenzo Vela) প্রভৃতি শিল্পীরা শিল্প-জগতে বেশ নাম করেছিলেন। শেষোক্ত শিল্পীর 'মরণোন্মুখ নেপোলিয়ান' (Dying Napoleon) প্যারিস-প্রদর্শনীতে সে সময় বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। ভাস্কর্য্যটিতে নেপোলিয়ানকে একটি কুর্সিতে বসা অবস্থায় দেখানো হ'য়েছে। অন্তিম অবস্থায় তাঁর হাত থেকে একটি প্ল্যান খসে পড়ে যাচ্ছে এই ভাবে তৈরী। অনেকটা অর্জ্জুনের শেষ অবস্থায় তাঁর নিজের গাণ্ডীব-ধনুক তোলবার ব্যর্থ চেষ্টার ছবির মত এই ছবিটি। তাঁর অভীষ্ট প্ল্যান আর

কার্য্যে পরিণত হ'ল না—হাত থেকে ফস্‌কে গেল আয়ুর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে!

উল্লিখিত শিল্পী ছাড়া গথিক যুগে জার্ম্মানদেশের গির্জ্জাগুলির মধ্যে এ্যাডাম ক্রাফ্‌ট (Adam Krafft), পেটার ভিস্‌চার (Peter Vischer) প্রভৃতির ভাস্কর্য্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের (Maximilian I) আদেশে তৈরী ইন্সব্রাকের (Innsbruck) বিরাট স্মৃতি-মন্দিরটির ভিতর ৮০০টি সাধু প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে এবং এই মন্দিরটি তৈরী হ'তে ৭৬ বৎসর সময় লেগেছিল (১৫০৮—৮৪)। ভার্সাই, লুভ প্রভৃতি উরোপের রাজপ্রাসাদাবলীর উদ্যানের মধ্যেও অনেক ভাস্কর্য্য দেখা যায়। উরোপের সভ্যতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সৌখিন রাজন্যবর্গ ভিক্টোরিয়ান যুগে ইটালী থেকে মর্ম্মর-প্রস্তরের মূর্ত্তি আনিয়ে উদ্যান-সজ্জার চেষ্টা করেছিলেন।

সম্রাট পঞ্চম চার্লসের (Charles V) সমসাময়িক যুগে জার্ম্মানীতে ভাস্কর্য্যকলার উন্নতি হ'য়েছিল। পরবর্ত্তী কালে (১৬১৪—৪৪) ত্রিশবৎসর-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে জার্ম্মানীতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'য়েছিল এবং সেই কারণেই শিল্পকলার সে সময় কোনোই উন্নতি হয়নি। কলা-লক্ষ্মী শান্তি-প্রিয়া আর সেই জন্যেই শিল্পীরা শান্তির মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে থাকেন। ফরাসী দেশেও নেপোলিয়ানের সময়, পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশ লুই (Louis XIV) এবং ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের (Frederick the Great) সময় কেবল অশান্তিরই বন্যা উরোপকে আছন্ন ক'রে ফেলেছিল, তাই সে সময় শিল্প-কলা তেমন অগ্রসর হয়নি। ঠিক সেই সময়কার

শিল্পকলার নিদর্শন ইংলণ্ডে পাওয়া যায় ফ্রান্সিস্ বার্ডের (Francis Bird ১৭০৬—১৭৩১) কাজে। 'সেণ্ট পল' (St. Paul) গির্জ্জায় মহারাণী এ্যানির (Queen Anne) মূর্ত্তি ইনি গড়েছিলেন। ফ্ল্যাকস্ম্যান (Flaxman ১৭৫৫—১৮২৬) নামক একটি বিচক্ষণ ভাস্কর ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবিতে লর্ড ম্যান্সফিল্ডের (Lord Mansfield) স্মৃতিবেদীর উপর তাঁর প্রতিকৃতিটি গড়েছিলেন। জোসেফ নোলেকেন্স (Joseph Nollekens—১৭৩৭—১৮২৩) প্রতিকৃতি গড়েই খ্যাত হ'য়েছিলেন। তাঁর সময় থেকেই মানুষের চেহারার প্রতিকৃতি গড়ার চলন হ'য়েছিল। প্রতিকৃতি মূর্ত্তি গড়ে সে সময় খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন সার ফ্রানসিস্ স্যান্‌ট্রী (Sir Francis Chantery) এবং এঁরই প্রতিযোগী ছিলেন তখন এলফ্রেড ষ্টিভেন্স (Alfred Stevens ১৮১৮—১৮৭৫), তাঁর সমকক্ষ তখন কেহই ছিলেন না। সেণ্ট পলের ডিউক অব ওয়েলিঙটনের মূর্ত্তি-সম্বলিত স্মৃতি-বেদিকাটি তাঁরই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

ইউরোপীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পে কখন কখন বাস্তব ভাব এরূপ প্রচণ্ড উগ্রভাবে দেখা দিয়েছিল যে, সেগুলি দেখলে প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন সেণ্ট পিটার্সবার্গ (এখনকার লেনিনগ্রাডের) যাদুঘরের প্রাচীন হর্ম্ম্যটির প্রবেশ-পথের দালানে যে মাংসপেশীযুক্ত পালোয়ানদের মূর্ত্তিগুলি থামের গায়ে লাগানো আছে, তার কথা বলা দরকার। এই মূর্ত্তিগুলির কাঁধের এবং হাতের উপর দালানের ছাদটি রাখা আছে। দেখলেই মনে হয় যেন ক্রীতদাসদের এইভাবে সাজা দেবার জন্যে রাখা হ'য়েছে—দেখলেই মনে

অশান্তির উদয় হয়। এই অতি-বাস্তবভাবের পরেই আবার যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল তার কথা এইবার সংক্ষেপে বলব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অতি-আধুনিক ভাস্কর্য্য-কলার আবির্ভাব হ'ল শিল্পী রোঁদার (Rodin) দ্বারা।

আধুনিক যুগ

রোঁদা প্রথমে আরম্ভ করেছিলেন প্রকৃতির পূজা এবং তাঁর শিল্পে তাই বাস্তবভাব প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর ছিল স্বাধীন-চিন্তা, তাই সৃষ্টির মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানই ছিল তাঁর শিল্প-সাধনা। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর তৈরী কবি ব্যালজাকের (Balzac) প্রতিমূর্ত্তিটি এ্যাকাডেমীতে গ্রহণ করা হ'ল না—তখনও কিন্তু তিনি তাতে কিছুই দমে যান নি। একটি মূর্ত্তিতে তিনি কবি ব্যালজাককে নগ্ন এবং একটিতে ড্রেসিং গাউন পরা গড়েছিলেন। সকলের চক্ষেই এ দুটিই বাড়াবাড়ি অস্বাভাবিক বোধ হ'য়েছিল। তারপর এমন একটি দিন এল, যখন তাঁর গড়া (১৮৮৬ এর) বার্জেস অব ক্যালে (Burgess of Calais) শিল্পী-সমাজে আদর্শ ভাস্কর্য্যকলার হিসাবে গণ্য হ'ল। এক সঙ্গে ৬টি মূর্ত্তিকে সাজিয়ে গড়ার রীতি তিনি যা প্রবর্ত্তন করলেন, পরবর্ত্তী শিল্পীদের সেটি আদর্শ হ'য়ে রইল। অনেকে তখন তাঁর কাজের অসম্পূর্ণভাব দেখে ঠাট্টা ক'রে বলত, "আধমেটে ক'রে মাটিতে মূর্ত্তি গড়ে নিয়ে কেবল হাড়ের অংশগুলি পালিশ করে দিলেই রোঁদার অনুরূপ কাজ হ'তে পারে।" তাঁর কাজ যত সহজ ব'লে লোকেরা তখন মনে করতেন আসলে তা ছিল না। তাঁর কাজের মধ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও জ্ঞানের পরিচয় নিহিত

আছে। তাঁর সঙ্গে একমাত্র মাইকেল আঞ্জিলোরই তুলনা হ'তে পারে। তাঁকে 'আধুনিক মাইকেল আঞ্জিলো' বলা যেতে পারে। তাঁর মনের উচ্চ পরিণতির কথা যা তাঁর লেখা ছিটে-ফোঁটা থেকে পাওয়া যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল। " ......সকলেই স্বাধীন। সৃষ্টিকর্তার মনই বাধ্য সকলের চেয়ে,—শতাব্দী চলে যাচ্চে একান্ত একটি চিন্তার ধারায়। ......মানুষ অসুখী, কেননা সে মনে করে যে শ্রমের নিয়মের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। সে শিশুর মত, দুরাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মত খেলা করতে চায় কে প্রধান হবে, কে আগে যাবে। সে তাই নিজের বুদ্ধিকে খর্ব্ব করে যা' সত্যই আমোদ বা গর্ব্ব চায় না...আমরা যতই সাধাসিধা হ'ব ততই সম্পূর্ণ হ'ব। কেননা, সাধাসিধার অর্থই হ'ল সাম্য ও সত্য!"

আধুনিক কাল হ'ল ভাঙ্গাগড়ার কাল। তাই এখন রোঁদার পর ক্রমশ মেস্‌ট্রোভিক (Mestrovic) মেট্‌সনার (Metzner), এপষ্টাইন (Epstein) প্রভৃতির আবির্ভাব দেখা দিয়েছে। এপষ্টাইন তাঁর শিল্পের অনুপ্রাণনা লাভ করেছিলেন হটেন্‌টট্‌, নিগ্রো প্রভৃতি আদিম বর্ব্বরদের শিল্প-কলা থেকে। মেস্‌ট্রোভিক পেলেন আসিরিয়ার প্রাচীন ভাস্কর্য্যকলা থেকে রস এবং মেট্‌সনার পেলেন দক্ষিণ আমে-রিকার 'মায়া' যুগের আদিম ভাস্কর্য্যকলা থেকে নূতন একটি ধারা। এঁদের ভাস্কর্য্যকলা একটি নূতন পথ অনুসন্ধান করছে আধুনিক ও আদিমের মধ্য দিয়ে, কিন্তু কোথায় যে গিয়ে শেষে ঠেকবে তা' বলা যায় না। এরই সঙ্গে আবার

এখনো সার্জেন্ট জেগার (Sargeant Jaggar), হেনরী পুল (Henry Poole, R. A), লিওনার্ড জেনিঙ্‌স (Leonard Jennings) প্রভৃতি সনাতনী-পন্থী শিল্পীরাও নিবিষ্টচিত্তে তাঁদের শিল্প-সাধনা করে যাচ্ছেন।

চিত্র-কলা

ভারতবর্ষের মত প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাবাসীদের চিত্রকলা উরোপেও নানা স্থানে পাওয়া গেছে। সান্‌তান্‌ডারের (Santander) নিকট আলটামিরা (Altamira) গুহায় এবং টৌর্‌টিসিলায় (Tortisilla) স্পেনে (Spain), ফরাসী দেশে লা-ইজির (Les Eyzies) নিকট দর্দোঁতে (Dordogne) এইরূপ গুহাবাসীদের চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এদের চিত্রকলায় বেশীর ভাগ শিকার ও যুদ্ধের ছবিই আছে। উত্তর উরোপ যখন বরফে ঢাকা থাকত, তখন দক্ষিণ উরোপের লোকেরা বল্‌গা হরিণ (Reindeer) শিকার ক'রে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রত। তাই তাদের ছবিতে হরিণ, অতিকায় (আদিম) হাতী, বাইসন প্রভৃতি দেখা যায়। এই ছবিগুলি দেখে বেশ বোঝা যায় যে মানুষ মাত্রেই যে দেশেরই হ'ক না কেন, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধ আছে এবং তার প্রকাশ কোন-না কোন উপায়ে তা'রা ক'রে থাকে। এই সকল চিত্রকলার সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের চিত্রকলার তুলনা করলে মানুষ ক্রমশঃ কি ভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, তা বেশ বোঝা যায়। তাই পৃথিবীর সকল সভ্য-জগতের শিল্পকলার গোড়ার পরিচয় দিতে গেলেই এই সকল গুহাবাসী মানবদের কাজের কথা বলতে হয়। এই গুহাবাসীদের চিত্রকলার পরেই আমরা যত প্রাচীন শিল্পকলার পরিচয় বিশেষ কিছু পাই না। তাই মিসরের দিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করতে হয়। উরোপের

আদিম চিত্রকলা
খৃঃ পূর্ব্বঃ ১৫০০০

শিল্পকলার ইতিহাসের সঙ্গে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ন্যায় চিত্রকলাও মিসরের পিরামিড ও মন্দিরের গায়ের আঁকা চিত্রকলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তার পরেই আসে আসিরিয়া ও বাইজান্টাইন শিল্পের কথা। এই সকল অতি প্রাচীন শিল্পকলা এক দেশ থেকে অপর দেশে বাণিজ্য, যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও পর্য্যটনের ফলে কি ভাবে প্রবেশ লাভ করেছিল তার ইতিহাস খুবই বিচিত্র।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে ভ্যান-ডাইকের 'এ্যাডোরেশন অব দি ল্যাম্ব' (Adoration of the Lamb) চিত্রটি ঘেণ্টের (Ghent) সেণ্ট ব্যাভোনের (St. Bavon) গির্জ্জা থেকে কি ভাবে নেপোলিয়ান লুট করে প্যারিসে এনেছিলেন এবং পরে শান্তিস্থাপনা হ'লে আবার সেটিকে ফিরিয়ে দেন। এই ছবির কিছু অংশ এখন দেখতে পাওয়া যায় বার্লিনের চিত্রশালায়। ভারতবর্ষের শিল্পকলাও বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বালী প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইরূপ আরো কত ঘটনাই পুরাকালে ঘটেছে, তা' কে নির্ণয় করতে পারে?

চিত্র-শিল্পের দুইটী ধারা

ভাস্কর্য্যও স্থাপত্যের ন্যায় উরোপের আদিম চিত্রকলা মিসরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় উরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে প্রাচ্য চিত্রকলা লেখা-শিল্পকেই (Calligraphy) অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছিল। তাই তাঁদের ছবিতে লেখার টানের মত রেখার টানের পরিচয় পাওয়া যায়। চীন, জাপান, ইরাণ ও ভারতের সকল আলেখ্যের মধ্যেই এই রেখার প্রাধান্যই

দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা'ছাড়াও আমাদের মনে হয় এই সকল চিত্রকলাকে বুঝতে হলে, জানতে হবে, রেখা ও রঙের দ্বারা রূপকারেরা যে কি একটি রূপলোকের সৃষ্টি দক্ষতার সঙ্গে করে গেছেন এবং তার মধ্যে তাঁদের বলবার কি কথাটি নিহিত আছে। মিসর ও এসিয়াখণ্ডের প্রাচীন চিত্রকলার নিপুণতার আদর্শ ছিল ভিন্ন, অর্থাৎ তখন চিত্রকলাকে পরবর্ত্তী যুগের উরোপীয় চিত্রের মত প্রকৃতির হুবহু নকলে গড়ার কোন চেষ্টাই ছিল না; বরং ছবির সৌষ্ঠব যাচাই হ'ত সেটিকে কুঁদে ছবির মত করে রচনা করা হয়েছে কিনা সেইটি দেখে। ছবিটি দেখে জীবন্ত আকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ব'লে চম্‌কে উঠবে না, 'ছবিটির মত' হওয়ায় তাকিয়ে দেখবার ও অন্তর্নিহিত রস গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। আদর্শ মানসীমূর্ত্তি যা' শিল্পীদের মানস কল্পনায় জাগে, তাকে জীবন্তভাবে শিল্পীরা ধরতে পারে না। বাস্তব ও ভাবপ্রবণ দুইটি ধারা ছাড়াও উরোপের চিত্রকলাকে মোটামুটি আরো দুইটি ধারায় ভাগ করা যায়। একটি 'সনাতনী প্রথা' (Classical School)—যার গোড়া হ'ল মিসর প্রভৃতি প্রাচ্য শিল্প এবং আর একটি তার পরবর্ত্তী শিল্পকলা, যাকে 'রোমান্টিক প্রথা' (Romantic School) বলা হয়। 'সনাতনী' প্রথাটিতে সব বাঁধা ধরা নিয়ম পাওয়া যায়। রোমান্টিক প্রথায় প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু আছে তারই ভিতর সহজে শিল্পী অনুপ্রেরণা লাভ করতে চান। এই 'রোমান্টিক' ভাব থেকে ক্রমশ সরে' গিয়ে আধুনিক যুগে 'কিউবিজম' (Cubism) 'ফিউচারিষ্ট' (Futurist) 'সার-রিয়ালিষ্ট' (Sur-realist) প্রভৃতি অভিনব শিল্পকলার

প্রচার হতে দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ আমরা সেগুলির বিষয় বলব।

গিওটো (Giotto) থেকে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর সার্জ্জেণ্টের (Sergent) চিত্রকলায় ক্রমশঃ বাস্তব ভাবের দিকে উরোপের শিল্পকলা অগ্রসর হয়েছিল। গিওটোর ঠিক পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যযুগে চিত্রকলা ভাবপ্রধানই ছিল। কিন্তু তখন কোনো শক্তিমান শিল্পীর অভ্যুদয় না হওয়ায় নিয়ম-কানুনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে চিত্র-শিল্পের প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। তারই ফলে গিওটোর পর থেকে প্রকৃতির হুবহু নকলের দিকেই মন দিয়েছিলেন উরোপের শিল্পীরা। এক জাতীয় ছবি আছে, যা' শুধু চোখে ভাল লাগে —তা' সর্ব্বসাধারণের বোধ্য ; তাতে চাই সুন্দর রূপ, গঠন প্রভৃতি কমনীয়তা। আর এক জাতীয় চিত্রকলা আছে, যা' মনকে একেবারে গিয়ে স্পর্শ করে; তার বাইরের আভিজাত্যের দরকার হয় না। মনের দিকের পরিচয় গোড়ায় গোড়ায় মধ্যযুগের শিল্পীরা দিয়েছিলেন তাঁদের চিত্র-পরিকল্পনায় এবং পরবর্ত্তী শিল্পীরা চোখে ভাল লাগারই পরিচয় রেখে গেছেন। তাই পরবর্ত্তী যুগের শিল্পীদের আদর্শ বা 'মডেল' রেখে ছবি আঁকার প্রয়োজন হয়েছিল— কেন-না প্রকৃতিই হ'ল তাঁদের ভাল-মন্দের মাপকাঠি। এইখানেই উরোপীয় শিল্পকলা এসিয়াখণ্ডের শিল্পকলা থেকে সরে গেল। শিল্পের এই দুটি ধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়। উরোপীয় শিল্পের আর এক পরিবর্ত্তন ঘটল,—খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও রোমান শিল্পের অন্তর্গত

'পেগান' দেবতাদের তিরোভাবের দ্বারা। বাইজান্তাইন (Byzantine) শিল্পে খৃষ্ট ধর্ম্মের নানা বিষয়কে রেখায় ও রঙে ভাব-মণ্ডিত করে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা হতে লাগল। পরবর্ত্তী ইটালীর ফ্লোরেন্‌টাইন (Florantine) শিল্পে এই বাইজান্তাইনের জের কিছু থাকলেও তা ক্রমশ বাস্তব-ভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। ঠিক আমাদের দেশের প্রাচীন রূপকারদের মত বাইজান্তাইন শিল্পীরা প্রথমেই মানসলোকে যে ভাবটি ফুটিয়ে তুলতেন চিত্রকলায় তাহাই রেখা ও রঙে গড়ে তুলতেন। তবে এগুলির মধ্যে একটা আলঙ্কারিক (decorative) ভাব থাকত যা' পরে ক্রমশ একটি বিশেষ রীতি-পদ্ধতিতে (Conventional form) পরিণত হয়েছিল।

মিসরের চিত্রকলা

মিসরের চিত্রকলার মধ্যেও এইরূপ বাঁধা রীতি-পদ্ধতি ও আলঙ্কারিক ভাব আছে। মানুষের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীগুলি ফুলপাতার রেখাছন্দ প্রভৃতি এমন করে শিল্পীরা ধরে রেখেছেন, যেন মনে হয় সেগুলি আপনা থেকেই জন্মেছে—মানুষের দ্বারা আঁকা হয় নি। তবে আধুনিক উরোপের বাস্তব-ভাবাপন্ন চিত্রকলা দেখার পর এগুলি দেখলে কাঠের পুতুলের মত নীরস বলে অনেক সরস লোকেই উড়িয়ে দেবেন। এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য দেশের চিত্র-কলার মত মিসরের চিত্রকলা ধূপছায়া (Light and shade) দিয়ে আঁকা হতো না—হতো শুধু রেখা ও রঙের লীলায়িত ভঙ্গীর দ্বারা। মিসরের চিত্রকলা বেশীর ভাগ পিরামিডের গায়ে, মন্দিরের দেয়ালে, কাঠের কবরের বাক্সে (যাতে মামী থাকে) আঁকা আছে। মিসরের চিত্রকলার মত প্রাচীন চিত্রকলা পৃথিবীতে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি। উরোপে

যখন সভ্যতার কোনো চিহ্নই ছিল না, তখন মিসরের চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। পরে গ্রীক সম্রাট অ্যালেকজাণ্ডারের সময়ে এবং ম্যাকাডোনিয়ান রাজাদের মধ্যে আরো সাত শত বৎসর এই মিসরের শিল্পকলা বিশেষ আদৃত হয়েছিল। ৩৯৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়স্ (Theodosius) ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় প্রাচীন পেগানদের মন্দির প্রভৃতি তুলে দিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মিসরের শিল্পকলাও আর উরোপে চলল না। আসিরিয়ার চিত্রকলা মিসরের মতই উরোপের প্রাচীন চিত্রকলাকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। মেসোপটামিয়ার টাইগ্রীস নদীর তীরে কুর্দ্দিস্থানে অসূরদের স্থাপিত সাম্রাজ্যের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আসিরিয়ায় ভাস্কর্য্য-চিত্রেরই চলন বেশী ছিল।

গ্রীক ও রোমান বা হেলেনেসটিক চিত্রকলা

রোমান সাম্রাজ্যে গ্রীকশিল্পের প্রেরণায় যে চিত্রকলার আবির্ভাব হয়েছিল তার পরিচয় প্রধানতঃ পাওয়া যায় পম্পিয়াই নগরের ভিত্তি-চিত্রে (Fresco)। এই ভিত্তি-চিত্রগুলি দু'প্রকারের তৈরী হ'তো। একটিকে 'ফ্রেসকো সেক্কো' (Fresco secco) এবং অপরটিকে 'ফ্রেস্‌কো বোনো' (Fresco Buono) বলা হয়। প্রথম প্রণালীতে দেয়ালের বজ্রলেপ (Plaster) শুকিয়ে গেলে তার উপর আঁকতে হয় এবং অপরটিতে ভিজে থাকতে থাকতেই আঁকতে হয়। চুন, বালি, এবং পাথরের গুঁড়াই হ'ল বজ্রলেপের উপাদান। ছবি শেষ হ'য়ে গেলে রজন আর তেল দিয়ে পালিশ করার প্রথা ছিল। আর এক প্রকারের ভিত্তি চিত্র তৈরী হ'তো তাতে রঙিন কাঁচ ভিজে বজ্রলেপের সঙ্গে

দেয়ালে বসাতে হ'তো—তাকে 'মোজেইক' (Mosaic) কাজ বলে। পম্পিয়াইতে 'ইসাসের যুদ্ধ' (The Battle of Issus) 'রহস্যের পরিচয়' (Initiation of Mysteries) 'ভেনাস এবং মার্স' (Venus and Mars) প্রভৃতি চিত্রকলায় তখনকার শিল্পীদের কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব চিত্রকলায় বাস্তব শিল্পের গোড়ার পরিচয় নিহিত আছে। এগুলির মধ্যে ছন্দবদ্ধ-ভাব (Composition) খুবই দুর্ব্বল। ছবির এলোমেলো বস্তু-সংস্থাপন চোখকে পীড়া দেয়। তবে তখন-কার শিল্পীদের উদ্যমের খুবই পরিচয় দেয়। এথেন্সের একটি প্রাচীন প্রাসাদে (Poikite Stoa) পলিনোটাসের (Poly-gnotus) আঁকা 'ট্রয়সহরের পতন' (Fall of Troy) ছবিখানি এবং অন্যান্য চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রগুলি দেখলে তখনকার চিত্রকলার একটি ইতিহাস জানা যায়। তখন ভিত্তি-চিত্র (Fresco) ছাড়াও কাঠের তক্তির উপর রঙ করে মোম গালিয়ে ছবি আঁকার একটি বিশেষ প্রথা ছিল। রোমান যুগের শিল্পীদের মধ্যে সিকোনের পমফিলাস একজন বেশ নামজাদা চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর একটি নিজস্ব 'স্কুল' তখন গড়ে উঠে-ছিল। তার প্রভাব পরবর্ত্তী কালেও কিছুকাল ধরে চলেছিল বলে জানা যায়। তা'ছাড়া আর একদল আলেকজাণ্ড্রিয়ান (Alexandrian) শিল্পীদের কথা জানা যায় যাঁদের প্রভাবের হাত থেকেও পরবর্ত্তী যুগের ইটালীর চিত্রকরেরা এড়াতে পারেন নি। এঁদের চিত্রকলা বাস্তবপন্থীর হলেও তখনও তা'র বাঁধুনি ঠিক হয় নি।

রোমান যুগের অতি প্রাচীনকালের চিত্রকলার নিদর্শন চিনামাটির ফুলদানীর গায়ে আঁকা যা' কিছু পাওয়া যায়।

সেগুলি বেশীর ভাগ দুটি কিম্বা তিনটি বিভিন্ন রঙে আঁকা। প্রাচীন রোমান-ভিত্তি-চিত্রে সর্ব্বপ্রথমে পারিপ্রেক্ষিক (Perspective) দেখাবার চেষ্টা দেখা যায়। ছবিতে আঁকা অলিন্দটি হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন কতদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—হলটি না জানি কত বড়। সেই সময় থেকে ছবির তিনটি আয়তন (Three dimensions) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা দেখানোর চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। তা'রই অবশেষে বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠেছিল আধুনিক কিউবিজম (Cubism) চিত্রকলায়। ৬৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এবং ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের দুর্য্যোগের পর পম্পিয়াই সহর পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে খুব বেশী রকমের বাহার দিয়ে আঁকা চিত্রকলা দেখা দিয়েছিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উরোপে শিল্পকলার রীতি পরিবর্ত্তন কিরূপ ঘটেছিল এই সব ছবিগুলি থেকে বেশ জানা যায়। রোমান খৃষ্টানেরা তা'দের মৃতদেহকে সুড়ঙ্গ-কবরঘরের দেয়ালে পুঁতে রাখতেন; তাকে 'ক্যাটাকোম্' (Catacomb) বলা হ'তো। সে সময়কার এই ধরণের কবরের দেয়ালের উপর ভিত্তি-চিত্র অনেক দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আঁকা ক্যাটাকোমের দেয়ালের ছবিতে অনেকটা গ্রীক ও রোমান ভাব মেশানো আছে। বেশীর ভাগ ছবি তখন নক্সাকারী (decorative) চিত্র হিসাবেই আঁকা হ'তো। তার পরবর্ত্তী যুগের ছবিতে প্রাচ্য প্রতীক বা রূপকের আতিশয্য দেখা দিয়েছিল। খৃষ্টীয় ছবি আঁকা সত্ত্বেও তার ভিতর পেগান (Pagan) দেবদেবীও বাদ দেন নি। অনেকটা ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধেরা যেমন হিন্দু দেবদেবীকে বাদ দেন নি, উরোপেও রোমান-খৃষ্টানেরাও প্রথমে

দু'দিকই বজায় রেখে চলেছিলেন। তাই দেখা যায়, 'অফ উস্' (Orpheus) সঙ্গীতের দেবতা 'হেলিঅস' (Helios) সূর্য্য-দেবতা প্রভৃতি ক্যাটাকোমের দেয়ালে স্থান পেয়েছেন। পরবর্ত্তী ক্যাটাকোমে ক্রমশ বাইবেল-উক্ত বিষয় বা ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই স্থান পায়নি। এই ক্যাটাকোমের চিত্রকলা পরবর্ত্তী চিত্রকলার ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়। এটিকে বাদ দিলে চলে না। যেমন আধুনিক কাব্য ভাল করে জানতে হ'লে প্রাচীন কাব্যকে বুঝতে হয়, তেমনি এই সকল প্রাচীন শিল্পীদের প্রচেষ্টার মধ্যেই পরবর্ত্তী শিল্পী-দের কাজের পরিচয় নিহিত আছে। সেণ্ট প্রিস্সিলার (St. Priscilla) ক্যাটাকোম চিত্রে যে ম্যাডোনার (Madonna) চিত্রটি আছে সেটি পরবর্ত্তী 'ফ্লোরেনটাইন স্কুলের' (Florentine School) বিখ্যাত ম্যাডোনার ছবিরই সূচনা। লিওনার্দো-দা ভিনচি'র (Leonardo da Vinici) বিখ্যাত 'শেষ ভোজের' (Last supper) ছবিখানির অনুরূপ চিত্র একটি ক্যাটাকোম চিত্রে আমরা দেখতে পাই, সেটি একটি খৃষ্টানদের ভোজের ছবি (A Christian Eucharistic Feast)। এই সব ক্যাটাকোমের ছবিতে খৃষ্টকে শ্মশ্রুমণ্ডিত ভাবে দেখানো হয় নি। রোমান ও গ্রীক পুরুষদের মত শ্মশ্রুমুণ্ডনের প্রথা তখনো চলেছিল। যিশুখৃষ্টের প্রথম শ্মশ্রু-যুক্ত ছবি আমরা দেখতে পাই রোমান 'পুডেনজিয়ানার (S. Pudenziana) একটি রোমান-খৃষ্টান 'মোজেইক' চিত্র-কলায়। এইরূপ প্রাচীন রোমান-খৃষ্টানদের মোজেইক চিত্রের মধ্যে ডামিয়ানোই' (SS Cosmae Damiano) প্রসিদ্ধ।

পরবর্ত্তী শিল্পে গ্রীক ও রোমান প্রভাব উরোপের সকল প্রদেশের চিত্রকলায় দেখা যায়।

এর ঠিক পরেই ইটালীর রোমান শিল্পের (Italian Romanasque) যুগ (৬০০—১২০০ খৃষ্টাব্দ)। এই যুগকে শিল্পকলার অন্ধকার যুগ (Dark Period) বলা হয়। কেন না তখন শিল্পীরা ঠিক প্রাচীন পদ্ধতিকে নকল ক'রে চলছে এবং নূতন কিছু আর দিতে পারছে না। উত্তর ইটালীতে এইরূপ কাজের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। মানুষ ও জন্তুর আলঙ্কারিক রূপকল্পনা (grotesque design) খুব তখন চলেছিল। এইরূপ রোমানাস্ক ধরণের সূক্ষ্ম চিত্রকলা (Miniature painting) প্যারিস, ভিয়ানা, সেণ্টগ্যালান প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ের জলরঙে (Water colour) আঁকা নক্সাকারী-করা পুঁথিপত্র (Illuminated Mss.) যুদ্ধ বিদ্রোহের দরুণ অনেক ধ্বংস পেয়েছে।

আমরা এখন বাইজান্তাইন স্কুলের (Byzantine school) চিত্রকলার কথা বলব। বাইজান্তাইন শিল্পের মধ্যে গ্রীক, রোমান, এসিয়ামাইনর ও মিসর সংস্কৃতির সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় বাইজান্তাইন শিল্পে প্রাচ্য গোঁড়া-বোনেদীয় আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের এত বাড়াবাড়ি যে তা'র আর অদল-বদল বহুযুগ ধরে হয় নি। সব চিত্রই তাই এক ধরণের বলে মনে হয় যদিও চিত্র-বর্ণিত বিষয় স্বতন্ত্র। পরবর্ত্তী যুগে গিওটো (Giotto) যখন প্রাচীন চিত্রকলার গতানুগতিকতার ভাব কাটিয়ে উঠ্‌লেন, তখন এই সব পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রকলাই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল এবং তাঁর পরবর্ত্তী যুগের সকল

বাইজান্তাইন চিত্রকলা

শিল্পীর কাজকে সফলতামণ্ডিত করে তুলেছিল। অতএব বাইজান্তাইন-শিল্প চিত্রকলার একটি বিশেষ দ্বার-স্বরূপ উরোপে চিরকাল আদৃত হবে।

সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন (Constantine) কন্‌স্‌তান্তি-নোপলের (Constantinople) বিজান্তিউমে (Byzantium) যখন খৃষ্টীয় গির্জ্জা প্রভৃতি তৈরী করালেন, তা'রই সঙ্গে সঙ্গে বাইজান্তাইন চিত্রশিল্প দেখা দেয়। রোমনগর থেকে রোম-সম্রাট বিজান্তিউমে গিয়ে নব-রোমনগরী কন্‌স্‌তান্তি-নোপল স্থাপন করেছিলেন। বড় বড় ধনী ও সভাসদেরাও রোম থেকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। তাঁহাদের ঘরবাড়ীও সম্রাটের প্রাসাদের চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট ছিল না এবং তাঁরাও তাই চিত্রশিল্পীদের দিয়ে ঘর-বাড়ীর সৌষ্ঠব বাড়িয়ে তুলতেন। জেরুসালমে যিশু খৃষ্টের কবর (Holy Sepulchre) হঠাৎ আবিষ্কৃত হওয়ায় সম্রাট তা'র উপরে একটি গির্জ্জা স্থাপনা করেছিলেন বলে জানা যায়। পরে সেই তীর্থ আগুনে পুড়ে যাওয়ায় তা'রই ভাঙা থাম প্রভৃতি দিয়ে কয়েকটি গির্জ্জা পরে সেখানে তৈরী হয়েছিল। সম্রাট এই গির্জ্জায় অনেক চিত্রকলা তখন আঁকিয়েছিলেন। তারই জের অন্যান্য গির্জ্জায় বিশেষ ক'রে 'সেণ্ট সোফিয়া'র (St. Sophia) গির্জ্জায় পাওয়া যায়। সেণ্ট সোফিয়ার গির্জ্জায় একটি ভিত্তি-চিত্রে সম্রাট্ কন্‌স্‌তান-তাইন তাঁ'র স্থপতিকে খৃষ্টের কবর-মন্দিরটি কিরূপ হবে বোঝাচ্ছেন এইরূপ ভাবে আঁকা আছে। সেণ্ট আইরিনের (St. Irene) গির্জ্জায় কন্‌স্‌তান্তিনোপলে রাভেন্নায় (Ravenna) গালা প্লসিডিয়ার (Galla Placidia) গির্জ্জায়,

বেথলেহেম (Bethlehem) নেটিভিটি (Church of Nativity) গির্জ্জায় বাইজান্তাইন চিত্রকলার অনেক দৃষ্টান্ত দেয়ালের গায়ে আছে। বেশীর ভাগ ছবিতে বাইবেল-বর্ণিত বিষয় আছে। তখন রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান সকল বিষয়ই ধর্ম্ম-যাজকদের হাতে, তখন ধর্ম্মগুরুর হুকুম অগ্রাহ্য করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই চিত্রকরেরা ছবি আঁকতেন গুরুর হুকুম মত। (It is for the Fathers to dispose and command, and for the painters to execute) এই বাইজান্তাইন চিত্রকলার প্রভাব পরবর্ত্তী খৃষ্টীয় চিত্রকলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগে চিত্রপটের রেখা ও রঙের স্থলে ধূপছায়া (Light and shade) পারিপ্রেক্ষিক বিজ্ঞান (Perspective) প্রভৃতির দিকে উরোপের শিল্পীরা অগ্রসর হলেন। বাইজান্তাইন চিত্রকলা পর্য্যন্ত উরোপের চিত্রশিল্প চিত্র-পটের মত ছিল তা'র পরের যুগে ছবিটি আর ছবির মত রইল না প্রকৃতির জীবন্ত প্রতিরূপে পরিণত হল। বাইজান্তাইন শিল্পের পতনের কারণ হল ধর্ম্মযাজকদের গোঁড়ামী—তাঁরা বাঁধা-ধরা নিয়মের বাইরে শিল্পীদের যেতে না দেওয়ায় ক্রমশ শিল্পীদের মনের তাগিদ কমে গেল এবং তারই ফলে পতন অনিবার্য্য হল।

রোমে সেণ্ট ভিটালে (St. Vitale), 'সেণ্ট অপোলিনারে নুওভো'তে (St. Apollinare Nuovo) বাইজান্তাইন চিত্র-কলা যথেষ্ট আছে। তৃতীয় ভেলেণ্টিয়ামের (Valentinam III) রাজত্বের সময় এই ধরণের শিল্পের খুবই প্রচার হয় এবং ৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এর প্রভাব প্রবর্ত্তিত থাকে। এর ঠিক্ পরবর্ত্তী কালের কাজ ভেনিসের (Venice) সেণ্টমার্কের

(St. Mark) পাঁচ হাজার ফুট পরিধি জুড়ে আঁকা 'মোজেইক' ছবি দেয়ালের উপর আছে। এগুলি সবই ১০ম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে আঁকা হয়েছিল। এসিয়া মাইনরে 'ক্যাপাডোসিয়া'র (Cappadocia) পাথরের গা কেটে তৈরী গির্জ্জায় (Rock-Church) এখনো কিছু কিছু প্রাচীনকালের বাইজান্তাইন চিত্রকলা আছে। দেয়ালে আঁকা ছবি ছাড়া খৃষ্টের বড় বড় ভক্তদের (Saints) মূর্ত্তি আঁকা কাঠের পাটা (Icon) ক্যাথলিক পুরোহিতেরা পূজার জন্যে আঁকিতেন। এই সময় রঙিণ কাঁচ বসিয়ে গির্জ্জার গবাক্ষের উপর ছবি আঁকার (Stained glass) প্রথা এবং ধর্ম্মপুস্তকের পুঁথির উপর ছবি আঁকার রেওয়াজ খুব চলেছিল। মিসরের সাক্কারা মঠে (Sakkara Monastry) ৬ষ্ঠ ও ৭ম খৃষ্টাব্দীর বাইজান্তাইন চিত্রকলা দেখা যায়। সোলোনিকায় (Solonica) প্রাচীন বাইজান্তাইন চিত্র এখনো কোনো কোনো স্থানে আত্মপ্রকাশ করে আছে। ছবিগুলি সবই ভারত বা এসিয়া খণ্ডের প্রাচীন চিত্রকলার পদ্ধতির মত রেখাও রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাধুদের ছবিতে জমির অংশ (Back ground) বেশীর ভাগ সোনালী রঙে মণ্ডিত করা হ'তো এবং অতিমানুষিক ভাব দেখাবার জন্যে মাথার উপর চারপাশে প্রভামণ্ডল (Halo) দেওয়া থাকত।

উরোপের চিত্রকলার মধ্যযুগে যে নবজাগরণের (Renaissance), সূচনা হয়েছিল তা'র বিষয় বলার আগে তা'র শ্রেণী-বিভাগের কথা বলা প্রয়োজন। চিত্রকলায় ইংরাজিতে 'স্কুল' বলে একটি শব্দ আছে। এক একটি

প্রাদেশিক বা ব্যক্তিগত চেষ্টায় গড়ে ওঠা শিল্পকলাকে সেই দেশের বা সেই লোকের 'স্কুল' নামে অভিহিত করা হয়।

উরোপের চিত্রকলার শ্রেণী বিভাগ

যেমন 'ফ্লোরেনটাইন স্কুল' (Florentine school)—ফ্লোরেন্স সহরের শিল্পীদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। গিওটোর স্কুল' (School of Giotto) শিল্পগুরু গিওটোর রীতি মেনে যে সকল শিল্পীরা চলেছিলেন তা'দের বোঝায়। চিত্রকলাকে আবার এক একটি কালে ভাগ করা যায়। যেমন 'রোমান যুগ' (Roman Period)—যে সময় রোমান সাম্রাজ্যে রোমানদের দ্বারা শিল্পকলা যা' কিছু গড়ে উঠেছিল। যে কালের যে জাতির আওতায় চিত্রকলা বিশেষ কোনো রূপ নিয়েছিল তা'র উপর লক্ষ্য রেখেও এইরূপ ভাগ করা প্রথা ছিল।

প্রাচীন উরোপীয় শিল্পীদের কাজকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) ধর্ম্মবিষয় চিত্রকলা, (২) ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন ক'রে যে সব চিত্র আঁকা হয়েছিল। (৩) প্রতিকৃতি (Portrait) (৪) এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য (Landscape)। প্রাচীনকালে প্রধানত ধর্ম্মবিষয় ছবিই আঁকা হ'তো। ফ্রা এ্যানজালিকো (Fra Angalico), লিওনার্ড্রো-দা-ভিনচি (Leonardo-da-Vinci), ভ্যান-আইক (Van-Eyek) প্রভৃতি শিল্পীরা ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং তাঁদের শিল্প-সাধনা ও ধর্ম্ম-সাধনা একই সঙ্গে চলেছিল। তাঁ'দের আঁকা ছবিগুলি গির্জ্জার দেয়াল কেবল অলঙ্কৃত করত না, সকলকে ধর্ম্মের দিকে অনুপ্রানিত করত। শোনা যায়, বোত্তি চেল্লীর আঁকা ভারজিন মেরীর অভিষেকের ছবিটিতে একটি লোকের

ছবি আঁকা আছে। তা'তে দেখানো হয়েছে যে লোকটি তা'র সম্মুখের দৃশ্য যা' সে দেখছে তাই আঁকছে। এই থেকে সকলের ধারণা এই হয়েছিল যে চিত্রের বর্ণিত বিষয় সবই সত্য এবং প্রত্যক্ষবোধে উজ্জ্বল।

চিত্রকলার নব উন্মেষ (Renaissance) মধ্যযুগ

উরোপের সনাতনী শিল্পের পূর্ণ জীবন দিতে সহায় হয়েছিলেন ধর্ম্মযাজক এসিসির সেণ্ট ফ্রান্‌সিস্ (St. Francis of Assisi)। তিনি ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং প্রকৃতির অন্তস্থলের ভাষাকে বোঝবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাই তিনি এইরূপ একটি যুগপরিবর্ত্তনের ব্যাপার চিত্রকলায় ঘটাতে পেরেছিলেন। এঁর সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে জোভানি সেনি (Giovanni Cenni) ওরফে কিমাবু (Cimabue ১২৪০—১৩০২ খৃঃ) প্রথম বাইজান্তাইনের বাঁধা-ধরা পথটিকে কেটে বেরবার চেষ্টা করেছিলেন। কিমাবুইর 'ম্যাডোনা' (মাতৃমূর্ত্তি) ছবিতে বাইজান্তাইন ভাব নেই বল্লেই হয়। এঁরই হাতে সাধু শিল্পী সেণ্ট ফ্রান্সিসের কবরঘরের দেয়ালে ছবি আঁকার ভার পড়েছিল। ইনি এই কবরঘরের দেয়ালটিতে তাঁর প্রিয় শিষ্য গিওটোকে (Giotto) নিয়ে ছবিগুলি এঁকেছিলেন। তাঁ'র এই তরুণ শিষ্য গিওটোই পরে পরবর্ত্তী যুগের প্রধান শিল্পী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিমাবুর মাতৃমূর্ত্তিটি যখন তিনি প্রথম (১৩০২খৃঃ) আঁকেন তখন ফ্লোরেন্স সহরের লোকেরা আনন্দে অধীর হয়ে সেটিকে কাঁধে করে রাজপথে মিছিল বার করেছিলেন। এখন সেটি সেখানকার কোনো একটি গির্জ্জায় রাখা আছে। ছবিটিতে বাইজান্তাইন শিল্পের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

এটি পরবর্ত্তী যুগের র‍্যাফেল প্রভৃতির মত ভাবে আঁকা মাতৃ-মূর্ত্তি নয়।

কিমাবুর চেয়ে তাঁর শিষ্য গিওটো খুব বেশী নামকরা শিল্পী হ'য়ে উঠেছিলেন। কিমাবুই গিওটোকে আবিষ্কার করে-ছিলেন। একদিন পথের ধারে রাখাল-শিশু গিওটোকে কিমাবু শ্লেটের উপর ছবি আঁকতে দেখে তিনি তাঁর চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতার সন্ধান পান। বালক গিওটোর আঁকা মেষশাবকটির ছবি দেখেই কিমাবু তখনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বালকটি ভবিষ্যতে একজন বিচক্ষণ চিত্রকর হতে পারবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গিওটোর পিতার নিকট গিয়ে গিওটোকে চিত্র-বিদ্যা শেখাবার অনুমতি চাইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গিওটো কিমাবুর কাছে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠ্‌লেন। গিওটো যে তারই ফলে তাঁর গুরুর সঙ্গে সেণ্ট ফ্রানসিসের কবর-ঘরের দেয়ালে ছবি এঁকেছিলেন সে বিষয় পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

গিওটো Giotto
১২৬৬ ?—
১৩৩৭ খৃঃ

গিওটোর বিষয় প্রবাদ আছে, যখন পোপ তাঁর নাম শুনলেন তখন তিনি গিওটোকে পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল গিওটোকে দিয়ে সেণ্টপিটার গির্জ্জায় ছবি আঁকাবার। দূতেরা পোপের আজ্ঞামত অন্যান্য শিল্পীদের কাজের নমুনা সংগ্রহ করার পর গিওটোর নিকট উপস্থিত হলেন। গিওটোর নিকট কাজের নমুনা প্রার্থনা করায় তিনি কম্পাসের সাহায্য না নিয়েই একটি বৃত্ত একটি কাগজে এঁকে দিলেন। পোপের দূতেরা ভাবলেন যে তিনি তাঁদের অর্ব্বাচীন ভেবে বুঝি ঠাট্টা করলেন। তাই তাঁ'র নিকট পুনরায় কাজের নমুনা চাওয়ায়

তিনি তাঁদের স্পষ্ট বল্লেন যে এর বেশী কিছু এঁকে দেবার ফুরসুৎ তাঁর নেই। পোপ কিন্তু একটানে আঁকা বৃত্তটি দেখেই শিল্পীর অসামান্য ক্ষমতার বিষয় বুঝে নিয়েছিলেন। গিওটোর শিল্পে রোমান-প্রভাব খুব বেশী পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁ'র শেষ বয়সের কাজে তার প্রভাব ক্রমশ তিনি ব্যক্তিগত প্রতিভার বলে কাটিয়ে উঠেছিলেন। এ্যাসিসি (Assisi), প্যাডুয়া, (Padua) সান্ত ক্রুজ (Santa Cruz) ও ফ্লোরেন্সের ভিত্তি-চিত্রে এখনো তাঁর কাজের অনেক পরিচয় আছে। গিওটোর সময় পারিপ্রেক্ষিক (Perspective) বিজ্ঞান অজ্ঞাত ছিল। তখনো ছবিটিকে ছবির মত করে আঁকার প্রথাই চলছিল। বাস্তব-শিল্পের চলন তখনো হয়নি উরোপে। 'এ্যাঞ্জিলো দি তোদিও জেডি' (Angelo di Todeo Gaddi) এবং স্পিনেলো আরেতিনো (Spinello Aretino) প্রভৃতি অনেক শিল্পী গিওটোকে অনুসরণ করে চলেছিলেন সে সময়।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে দেয়ালে ছাড়া পুঁথির উপর ছবি, কাঠের পাটার উপর লাক্ষা রঙের আইকন (Icon) তখন আঁকা হ'তো। এগুলি সাধারণতঃ লাক্ষা বা জলরঙে (Water colour) আঁকা হ'তো। ভ্যান আইকই প্রথমে তেলরঙের (Oil colour) আঁকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

হুবার্ট্ ভ্যান-আইক (Hubert Van Eyck) ১২৬৫ খৃঃ—?

উরোপের চিত্রকলার কথা বলতে গেলে গিওটোর পরেই ভ্যান আইকের কথা বলতে হয়। জলরঙে ছবি এঁকে রোদে শুখাবার কালে ছবি মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যেতো। তাই ভ্যান আইক তেলে গুলে রঙ ব্যবহার করার রীতি গভীর

গবেষণার ফলে আবিষ্কার করেছিলেন। এঁর আঁকা ‘মেষ-শাবকের পূজা” (The Adoration of the Lamb) একটি বিখ্যাত চিত্র। ঘেণ্টের (Ghent) সেণ্ট বাভোনের গির্জ্জায় (St. Bavon) এই ছবিটি আছে।

ভ্যান আইকের মতই ফ্রা-এ্যাঞ্জিলিকো একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। ইনি ছিলেন একজন ধর্ম্মযাজক-শিল্পী। এঁর কাজও গিওটোর প্রবর্ত্তিত ধারায় চলেছিল। পুঁথির উপর ছবি আঁকায় ইনি খুব দক্ষ ছিলেন। ফ্লোরেন্স সহরে তাঁর আঁকা সান মার্কো কন্‌ভেণ্টে (San Marco Convent) এখনো অনেক চিত্রকলা আছে। এখনকার উরোপীয় শিল্পীর চোখে এঁর আঁকা ছবিতে সাধাসিধা ভাবটি মোটেই ভাল লাগে না। কেন-না তাঁর কাজে বিজ্ঞানসম্মত শারীর-তথ্য বা পারিপ্রেক্ষিকের পরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁর আঁকা সহজ ভঙ্গীটিতে তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকটা আমাদের দেশের কাঙড়া স্কুলের চিত্রকলার মত। তাঁর আঁকা কতকগুলি ধর্ম্মযাজকদের প্রতিকৃতি-চিত্র দেখলে জয়পুরের চিত্রশালায় রক্ষিত প্রাচীন রাজপুত প্রতিকৃতি-চিত্রের কথা মনে পড়ে। পট-যবনিকায় (Background) সোনার পাত বসানোর প্রথা ছিল ঠিক প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার মত। এঁর সময়কার বেনোৎসো গোৎসলির (Benozzo Gozzoli) কাজ পিসার (Pisa) ক্যাম্‌পোসান্তোতে (Campo-santo) এবং মেজাইএর যাত্রার (Journey of the Magi) ছবিটি ফ্লোরেন্সে পালাৎসো রিকার্দ্দিতে (Palazzo Riccardi) আছে। ফ্রা-এ্যাঞ্জিলিকোর সমসাময়িক আগে একজন

ফ্রা-এ্যাঞ্জিলিকো
(Fra-Angelico)
১৪১৩ খৃঃ—?

ছিলেন "ফ্রা ফিলিপো লিপি" (Fra Filippo Lippi)। তাঁর 'ম্যাডোনা', 'ভার্জ্জিন মেরী' ছবিগুলি খুব বিখ্যাত। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দীতে ফ্লোরেন্সে দোমেনিকো ঘিরলাণ্ডায়ো (Domenico Ghirlandaio) এবং সান্দ্রো বটিচেলী (Sandro Botticelli) নামক দু জন শক্তিশালী শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঘিরলাণ্ডায়োর আঁকা মেজাই-এর পূজা (Adoration of the Magi), রাখালের পূজা (Adoration of the Shepherds) প্রভৃতি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বটিচেলীর গুরু ছিলেন একজন সেঁকরা। তাঁরই নামে শিল্পীর নাম বটিচেলী হয়েছিল। তখন শিল্পীরা গুরুর নাম মাঝে মাঝে এইভাবে নিতেন। 'বটিচেলী' উরোপের চিত্রশিল্পে একটি যুগ পরিবর্ত্তন করে দিয়েছিলেন। সাধারণতঃ তিনি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। তিনি বাস্তব-পন্থীদের গুরু হলেও খুবই কল্পনাপ্রবণ শিল্পী ছিলেন। তাঁর আঁকা 'ভেনাসের জন্ম' (Birth of Venus), 'মার্স ও ভেনাস (Mars and Venus), মিনার্ভা (Minerva) প্রভৃতি চিত্রকলা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এঁর 'বসন্তের হেঁয়ালি' ছবিটিতে তিনি একটি সাবলীল গতি রেখাছন্দের এবং রঙের মধ্যে যা' দেখিয়েছেন, তা' সত্যই খুব প্রশংসনীয়। বটিচেলীর নারীমূর্ত্তি—আদর্শ নারীমূর্ত্তি ; তার মধ্যে এমন একটি অতি-মানবীয় ভাব আছে, যাতে মনে হয় সেটি এই মরজগতের যেন নয়।

সান্দ্রো
বটিচেলী
Sendro Botti-
celli) ১৪৪৬—
১৫১০খৃঃ

বটিচেলীর পর মাইকেল আঞ্জিলোর সমসাময়িক বড়

শিল্পীদের মধ্যে লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চির নাম প্রথমেই করতে হয়। ইনি একাধারে অঙ্কশাস্ত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও সঙ্গীত-বিত্থায় পারদর্শী ছিলেন। তা ছাড়া লিওনার্দো দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বাষ্পপোত, জলে ভাসবার বেল্ট (swimming belt), ক্যামেরা, বিমানপোত (Air ship) প্রভৃতির বিষয় গবেষণা করেছিলেন। তিনি জানতেন, সকল বাধা চেষ্টার দ্বারা মানুষ দূর করতে পারে। শিল্পকলার বিষয় তিনি বলতেন: "সুন্দর দেহ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু শিল্পকলার শেষ নাই।" আর বলতেন: "সে কৃপার পাত্র যে অর্থের জন্য নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দেয়।" তিনি চোখকে বলতেন—"আত্মার জানালা"।

লিওনার্দো-দা-ভিনচি (Leonardo da Vinci) ১৪৫২—১৫১৯ খৃঃ

এঁর "খৃষ্টের শেষ-ভোজ" (Last Supper) ভিত্তি-চিত্রটি জগৎ-বিখ্যাত। মিলানের (Milan) একটি পরিত্যক্ত পুরোহিতাবাসের দেয়ালে তিনি ছবিখানি এঁকে গিয়েছিলেন। চুনবালীর দেয়ালে তৈলচিত্রটি আঁকার দরুণ প্রায় ধ্বংস হয়ে এসেচে। দুঃখের বিষয়, ভিত্তি-চিত্র আঁকার পদ্ধতি অনুসারে ছবিখানি আঁকা হয় নি। ছবিটি নষ্ট হবার আর এক কারণ জানা যায় যে নেপোলিয়ানের ইটালীরাজ্য আক্রমণের সময় তাঁর সৈন্যেরা সেই বাড়ীটিকে আস্তাবলে পরিণত করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছবিটির উপর এত অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও তার ভিতরকার অনুপম-অনুভূতিটি এখনো মুছে যায় নি। এই ছবিটি সমসাময়িক যুগে এত আদৃত হয়েছিল যে তার অনেক নকল সে সময় শিল্পীরা নানাস্থানে করেছিলেন। তা ছাড়া শিল্পীর আঁকা খসড়াটি

এখনো এ্যাকাডামিয়াতে (Accademia) ভেনিসে সযত্নে রাখা আছে। ভিন্‌চির আঁকা মনালিসার (Mona Lisa) প্রতিকৃতি, 'পার্ব্বত্য প্রদেশে ভার্জ্জিন' (Virgin among the Rocks) 'মেজাইএর পূজা' (Adoration of the Magi) প্রভৃতি চিত্রও জগৎ-বিখ্যাত। ধূপ-ছায়া (Light and Shade) দিয়ে ছবি আঁকার উৎকর্ষ এঁরই দ্বারা প্রথমে সাধিত হয়। তা ছাড়া এঁর রেখা-নৈপুণ্যও খুব ছিল। এঁর সময় মাইকেল আঞ্জিলোর মত আরো একজন বড় শিল্পী র‍্যাফায়েল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভিন্‌চি ছিলেন র‍্যাফায়েলের বয়োজ্যেষ্ঠ। মিলান 'এ্যাকাডামিতে' ভিন্‌চির কাছে মানুষ হয়েছিলেন পরবর্ত্তী অনেক শিল্পী, যাঁরা শিল্পে নবযুগ আনার সহায়ক ছিলেন। মাইকেল আঞ্জিলোর সঙ্গে একত্রে প্লাৎসোর (Plazzo) পরিষদ্‌-মন্দিরে (Council Chambers) ছবি আঁকার সুযোগ হয়েছিল ভিন্‌চির।

ফরাসী দেশের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস্ (Francis I) তাঁর গুণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং বেশ মোটা মাইনে দিয়ে তাঁকে শেষ জীবনে ফ্রান্সে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। ইনি মাইকেল আঞ্জিলো এবং র‍্যাফায়েলের মত শিল্প-সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন বিবাহ না করে'।

মাইকেল আঞ্জিলো (Michael Angelo) ১৪৭৫—১৫৬৪ খৃঃ

উরোপের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল আঞ্জিলোকে সব চেয়ে প্রতিভাবান ও শক্তিশালী শিল্পী বলেই সকলে জানেন। তিনি একাধারে স্থপতি, দার্শনিক ভাস্কর, ও চিত্রকর ছিলেন। স্থপতি হিসাবে রোমের সেণ্ট পিটার্সের (San Pietro) গির্জ্জার পরিকল্পনাই তাঁর প্রধান কাজ।

পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস (Pope Julius II) তাঁর নিজের জন্যে এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিটির পরিকল্পনার ভার মাইকেল আঞ্জিলোকে দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর কেবল স্থাপত্য-কলার পরিচয় ছাড়াও তাঁর গড়া ভাস্কর্য্যেরও নিদর্শন প্রচুর আছে। ভাটিগানে সিস্‌টাইন গির্জ্জার (Sistine chapel) দেয়ালে ছবি আঁকার কালে জানা যায় তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র চলেছিল এবং যাতে তাঁর কাজ পণ্ড হয় তার যথেষ্ট চেষ্টা দুষ্ট লোকেরা করেছিল। তিনি অমানুষিক পরিশ্রমে কাহারো সাহায্য না নিয়ে "মনুষ্য সৃষ্টি" (The Creation of Man), "পতন" (Fall), "কালের শেষ" (Deluge), "সৃষ্টিকর্ত্তার ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি-চেষ্টা" (Almighty Brings Order out of Chaos) প্রভৃতি ছবি যা' এঁকে রেখে গেছেন, তা' শিল্পকলায় এক যুগ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল উরোপের শিল্পে। মাইকেল আঞ্জিলো তাঁর মৃত্যুকালে বন্ধু কার্ডিনেল সালভিয়াটিকে (Cardinal Salviate) শেষ কথা এই বলে-ছিলেন: "দুটি কারণে আমার অনুতাপ হয়; প্রথমত আমার আত্মার মঙ্গলের জন্যে বেশী কিছু করিনি এবং ঠিক যে সময় শিল্পকলার অক্ষর পরিচয় আমার হ'ল তখনি আমায় মরতে হচ্চে।" তাঁর এই শেষ কথাটিতেই তাঁর সকল পরিচয় নিহিত আছে। যে যুগে ইনি জন্মেছিলেন সে সময় ইটালীর আরো অনেক শিল্পীর এক নিশ্বাসে নাম করা যেতে পারে। যথা: টিশিয়ান (Titian), র‍্যাফায়েল (Raphael), করেজিও (Correggio), রুবেন্স (Rubens), ও বেলিনি (Bellini)। এঁরা এক এক জন শিল্পকলায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন।

আমাদের দেশে মা যশোদার যেমন কদর হিন্দুদের মধ্যে আছে, তেমনি ম্যাডোনার কদরও উরোপে খুব দেখা যায়— বিশেষ করে ক্যাথলিকদের মধ্যে। ক্যাথলিকরা খৃষ্টমাতার পূজা করায় ইটালীর শিল্পীরা তখন মাতৃমূর্ত্তি আঁকার দিকে বিশেষ মন দিয়েছিলেন। র‍্যাফায়েলের মত মাতৃমূর্ত্তি আঁকতে সিদ্ধহস্ত আর কেহই জন্মান নি। তাঁর ছবিতে মার মুখের সকরুণ স্নেহোজ্জ্বল ভাব যা ফুটে আছে, তার নকল এ পর্য্যন্ত কেহই করতে পারেন নি। তাঁর প্রথম আঁকা মাতৃমূর্ত্তিটিতে (Ansideia Madonna) তাঁর শিল্প-প্রতিভা মূর্ত্ত হয়ে আছে। তখনও অবশ্য তিনি তাঁর গুরু পেরুজিনোর (Perugino) প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর পরবর্ত্তী মাতৃমূর্ত্তির চিত্রকলা যথা 'ম্যাডোনা দেলা সেদিয়া' (Madonna della Sedia), 'ম্যাডোনা দি সান সিস্‌তো' (Madonna di San Sisto) প্রভৃতির মধ্যে তাঁর নিজের হাতের কাজের একটি বিশেষ রূপ ধরেছে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতির গতানুগতিক ভাব নেই, একটি বৈশিষ্ট্য ভাব আছে। তখনকার কালে ইটালীর প্রাচীন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক 'সান্‌তি কনভারসেসিওনের' (Santi Conversazione) ধাঁচে সকলেই তখন ছবি আঁকতেন। তাতে নিয়ম ছিল যে ছবিটির মধ্যকার প্রধান মূর্ত্তিটির আশেপাশে একাধিক মূর্ত্তি আঁকতে হতো এবং তাঁদের প্রত্যেকের মুখে একটি প্রার্থনার ভাব ফোটাতে হতো। র‍্যাফায়েলের বিখ্যাত 'ম্যাডোনা দেলা সেদিয়া' (Madonna Della Sedia) ছবিখানি ফ্লোরেন্সে পেটি

র‍্যাফায়েল সেন্‌জিও (Raphiael Sanzio) ১৪৮৩—১৫২০ খৃঃ

গ্যালারীতে (Petti Gallery) আছে। এখানি তিনি রোমে দশম পোপ লিওর (Pope Leo X) কাছে কাজ করবার সময় এঁকেছিলেন। ভাটিকানের ভিত্তি-চিত্রে র‍্যাফায়েলের হাতের অনেক কাজ দেখা যায়। 'ম্যাডোনা দি সান সিস্‌টো' ছবিখানি এখন ড্রেসডেনের চিত্রশালায় আছে। এই ছবিটিতে শিশু-খৃষ্ট কোলে ভার্জ্জিন মেরি দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর দু পাশে ধার্ম্মিক পোপ সেণ্ট সিক্সটাস্‌ আর সেণ্ট বারবারা আছেন। রোমান গভর্ণর নিকোমেডিয়া (Nicomedia) সেণ্ট বারবারাকে তাঁর পিতাকে দিয়ে হত্যা করিয়েছিলেন। এই ছবিটি খৃষ্টধর্ম্মের বিষয় হলেও সকল কালে সকল দেশের লোকেরই ভাল লাগবার কথা। এই কারণেই জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে র‍্যাফায়েল অমর হয়ে আছেন।

র‍্যাফায়েল আর্ব্বিনোর (Urbino) একটি গরীব চিত্রকর জিওভানি সান্তির (Giovanni Santi) পুত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর হয়েছিল। তিনি অতিশয় প্রিয়দর্শন এবং বন্ধু-বৎসল লোক ছিলেন। সকল দেশেরই তরুণ শিল্পীদের মনে বড় হলে র‍্যাফায়েল হবার ইচ্ছা স্বতঃই জাগরিত হয় এবং তারা তাঁর শিল্প দেখে অনুপ্রাণনাও পেয়ে থাকে। ভাটিকানে খৃষ্টের স্বর্গারোহণ (Transfiguration) আদম ও ইভ (Adam and Eve), স্টানজা দেলা সেগনাটুরার (Stanza della Sagnatura) সমস্ত ভিত্তিচিত্রগুলি এবং মিলানের ভার্জ্জিনের বিবাহ (Betrothal of the Virgin) প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

র‍্যাফায়েলের সমসাময়িক বেলিনি ছিলেন একজন দিগ্‌গজ

শিল্পী। বেলিনির দুই ভাই চিত্রকলায় বেশ নাম করেছিলেন। 'জেনটাইল' (Gentile) অপেক্ষা জিওভানি (Giovanni) শিল্পজগতে বেশী প্রসিদ্ধ। এঁদের পিতা জ্যাকোপো বেলেনি (Jacopo Bellini ১৪০০-১৪৭১) তখনকার একজন নামজাদা শিল্পীর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে বিশেষ নাম করতে পারেন নি। তাঁর পুত্র জেন্‌টাইল কন্‌স্তান্তিনোপলে দ্বিতীয় সুলতান আহম্মদের দরবারে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর আঁকা ভিত্তিচিত্রে আমরা মিনার, পাগড়ী প্রভৃতি প্রাচ্যভাবের চিহ্ন দেখতে পাই। তিনি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে মারা যান। জিওভানি ভিনিসিয়ান (Venetian) শিল্পীদের মধ্যে প্রকৃতিকে জীবন্তভাবে ধরতে পারতেন খুব বেশী করে। অবশ্য পরবর্ত্তী রামব্রান্ত (Rembrandt) বা ভাল্‌সাক (Velazquez) প্রকৃতিকে নকল করার প্রথা আরো বেশী আয়ত্ত করেছিলেন। জিওভানি ৫০ বৎসর বয়সে প্রথম জলরঙ (water-colour) ছেড়ে তৈলচিত্রে (Oil colour) ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছিলেন। এঁর আঁকা ছবিগুলিতে বর্ণ-সমাবেশের অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই কারণেই তিনি শিল্প-জগতে চিরস্মরণীয় থাকবেন। তাঁর মাতৃমূর্ত্তি ছবিটির মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। এ্যালবার্ট ডুরার (Albert Durer) বেলিনির সংস্পর্শে এসে বর্ণ-সমাবেশের হদিস জানতে পেরেছিলেন; ডুরার গোড়ায় ছিলেন খসড়া (Sketch) আঁকায় বিশেষ সিদ্ধহস্ত।

জিওভানি বেলেনি (Giovanni Bellini)

এ্যালবার্ট ডুরার জার্ম্মানীর একজন মুখোজ্জ্বলকারী চিত্র-শিল্পী ছিলেন। তাঁর পৈত্রিক ব্যবসা ছিল সেঁকরার কাজের,

এ্যালবার্ট ডুরার
Albert Durer.

কিন্তু তিনি তাঁর পিতার কাজে যোগদান না করে চিত্রকলায় মন দিয়েছিলেন। ডুরারের জীবনে সেই কারণেই পিতার অসন্তোষ তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। তাঁর স্ত্রীরও অধ্যাত্মবোধ না থাকায় এবং সমসাময়িক শিল্পি-সমাজে তাঁকে সকলে ঠিক্ বুঝতে না পারায় তাঁর জীবনে আনন্দ খুবই কম ছিল। ডুরার জার্ম্মানী ও ইটালীর সকল তীর্থই পর্য্যটন করেছিলেন। ইটালীতে বৃদ্ধ বেলেনির সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহৃদ্য হয়। ডুরারের কাজে প্রাচীন গ্রীসের কৃষ্টির অনুপ্রাণনার পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় অনেকে তাঁকে সনাতনী-পন্থী বলে উপেক্ষা করত। ডুরারের 'বিষাদ' (Melancholy) চিত্রখানিতে তাঁর নিজের জীবনের সকল বিষাদকেই যেন ধরে রেখে দিয়েছেন। তাঁর 'আত্ম-প্রতিকৃতি' (self-portait), 'সেণ্ট জন' (St. John) ও 'সেণ্ট পিটারের' (St. Peter) ছবি, 'মেজাই-এর পূজা' (Adoration of the Magi) প্রভৃতি চিত্র তাঁকে অমর করে রেখেছে।

টিশিয়ান
(Titian)

এই সময়কার একজন বিরাট ক্ষমতাশালী শিল্পীর কথা এইবার বলব। টিশিয়ান ছিলেন একজন যোদ্ধার ছেলে এবং প্রথমে ভেনিসে তাঁর পিতা তাঁকে আইন পরীক্ষা দেবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম চিত্রকলা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি অল্পদিনেই চিত্রকলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং ১৫০৭ খৃঃ তিনি শিল্পী জিরোজিওর সঙ্গে ভেনিসে একটি জার্ম্মাণ বণিকের বাড়ীর দেয়ালে ছবি এঁকেছিলেন,—সেই তাঁর প্রথম বড় কাজ। তিনি খুব শীঘ্রই শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেছিলেন। রুবেন্সের (Rubens) মত তাঁর চিত্রের চাহিদা পোপ, ধনী, গৃহস্থ, এমন কি, দেশ-বিদেশের সম্রাটদের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। তাই দেখা যায়, ফরাসীদেশের সম্রাট 'প্রথম ফ্রান্সিস' (Francis I) তাঁকে নিজের দরবারে আহ্বান করেছিলেন। টিশিয়ান সম্রাটের যে একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, সেটি লুভের রাজপ্রাসাদে (এখন যাদুঘর) রাখা আছে। তারপরে তিনি স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের অনুরোধে তাঁর দরবারে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজ করেছিলেন বলে জানা যায়। টিশিয়ান সে সময়কার যাবতীয় বড়লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সেইজন্যেই তাঁকে বড়লোকের প্রতিকৃতি এবং তাঁদের ফরমাস-মত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক চিত্র আঁকতে হয়েছিল। তাঁর আঁকা—'পেসারো'-পরিবারের মাতৃমূর্ত্তিটি (Madonna of the Pasaro Family) ম্যাডোনার স্বর্গারোহণ (The Assumption of the Madonna), পবিত্র ও অপবিত্র ভালবাসা (The Sacred and Profane Love), ভেনাস (Venus) প্রভৃতি উরোপীয় চিত্রকলার গৌরব।

মাইকেল আঞ্জিলো দীর্ঘজীবন লাভ করায় টিশিয়ানের কাজও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। মাইকেল আঞ্জিলো সনাতনী শিল্পের এত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন যে, টিশিয়ানের কাজ তাঁর খুব ভাল লাগলেও তিনি বলতেন, "আহা যদি এরা সনাতনী মর্ম্মর-মূর্ত্তিগুলিকে দিনের পর দিন আমাদের মত দেখতে শিখতো!" টিশিয়ানও মাইকেল আঞ্জিলোর মতই দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৯৯ বৎসর হয়েছিল। তিনিও মাইকেলের মতই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

নিজের কাজ থেকে বিরত হন নি। তাঁর আঁকা ছবি ভেনিসে ও লুভে অনেক আছে। তাঁকে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ 'নাইট অব্ দি গোল্ডেন স্পার' (Knight of the Golden Spur) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই উপাধির বিশেষত্ব এই যে রাজ-দরবারে যখন ইচ্ছা তিনি প্রবেশ-লাভ করতে পারতেন। ফরাসী দেশের রাজা তৃতীয় হেন্‌রী (Henry III) তাঁকে বিশেষ সম্মানিত করেছিলেন তাঁর ৯৭ বৎসর বয়সে।

জিওরজিওঁ
(Giorgione)

টিশিয়ানের সমসাময়িক শক্তিশালী শিল্পীদের মধ্যে জিওরজিওঁও একজন ছিলেন। তাঁর আঁকা 'ভেনাসের নিদ্রা' (Sleeping Venus), 'ঝড়' (The Tempest), 'কবর' (the Entombment) 'ক্রশবহন' (Bearing of the Cross) 'দুঃখের মানুষ' (Man of Sorrow) প্রভৃতি চিত্রগুলি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। 'ক্রশবহন' ও 'কবর' ছবি দুখানিতে মহাত্মা খৃষ্টের মুখের মধ্যে করুণ শান্ত ভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাতে মনে হয় মানব-চরিত্রের ভাব ফোটাতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

'এল গ্রিকো' ছিলেন টিশিয়ানের একজন প্রধান ছাত্র। এঁর আসল নাম ছিল 'ডোমেনিহকোস্ থিওটোকোপুলি' (Domenikos Theotokopuli)। এঁকে গ্রীক শিল্পী (গ্রিকো) বলেই সকলে ডাকতেন। ইনি চিত্রে বস্তু-সংস্থাপনের (Composition) দিকেই বেশী ঝোঁক দিতেন। তাই তাঁর চিত্রে বস্তু-সমবায় খুবই ভাল হ'ত। ইনি স্পেনের রাজা

এল্ গ্রিকো
(El Greco)

দ্বিতীয় ফিলিপের (Philip II) দ্বারা স্পেনে আহূত হন এবং তাঁর জন্যে অনেক ছবি সেখানে এঁকেছিলেন। এঁর কাজের মধ্যে 'ঘোষণা' (The Amenciation), ভার্জ্জিন মেরীর স্বর্গে প্রতিষ্ঠা (The Assumption of the Vergin), জন্মোৎসব (The Nativity), ঈশ্বরের কোলে যীশুখৃষ্টের মৃত্যু (Christ dead in the arms of God), প্রভৃতি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

টিন্‌টোরেটো (Tintoretto)

টিন্‌টোরেটো ছিলেন একজন রঙসাজের ছেলে। সৌভাগ্যের বিষয় ছোট বেলায় টিশিয়ানের দ্বারা তাঁর চিত্র-শিল্পে 'হাতেখড়ি' হয়েছিল। টিশিয়ানের নিকট দীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব হতে দেন নি। অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনভাবে ভিনিসের গির্জ্জায় ও আশ্রমের (Convent) দেয়ালে ছবি আঁকবার সুযোগ পান। 'সান মার্কোর' (San Marco) আশ্রমের দেয়ালে ছবি আঁকাতেই তাঁর নাম সারা ইটালী ও উরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইনি এক একটি বিরাট আকারের ছবি এঁকে রেখে গেছেন। তাঁর একটি ছবি আছে যার মাপ ৮৪ ফুট লম্বা এবং ৩৪ ফুট চওড়া। ক্যাম্বিশের উপর আঁকা ছবির মধ্যে এঁর চেয়ে বড় ছবি জগতে সেকালে আর কেহই আঁকেন নি।

এই সময়কার উরোপের আরো দু জন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে, যাঁদের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় যুগে যুগে লোকে পাবে। 'রুবেন্স' ও 'হলবেনের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হলবেন' দু জন ছিলেন। ছোট হলবেনই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এঁর পিতা ও বেশ নামজাদা শিল্পী ছিলেন। হলবেনের বিষয় সম্রাট অষ্টম হেনরী (Henry VIII) বলেছিলেনঃ "আমি ছয় জন চাষাকে ছয়টি 'পিয়ারেজ' উপাধিতে ভূষিত করতে পারি, কিন্তু ছ জন 'পিয়ার' থেকে 'হলবেনের' মত একটি শিল্পীও তৈরী করতে পারি না। (I could make six peers out of six ploughmen, but out of six peers I could not make one Holbein)। ইংলণ্ডেশ্বর হলবেনকে ব্যাসেল (Basel) থেকে তাঁর দরবারী শিল্পী করে আনান। দরবারে তিনি কাঠের ও তাঁবার চাদরের উপর অনেক তৈলচিত্র এঁকে-ছিলেন। হলবেনের আঁকা প্রতিকৃতি চিত্রগুলি তখনকার-কালের প্রতিকৃতি চিত্রের উচ্চ আদর্শ হয়ে চিরকাল থাকবে। তাঁর আঁকা 'সার টমাস মোর' (Sir Thomas More) পরিবারের ছবিগুলি লুভের প্রাসাদ-যাদুঘরে রাখা আছে। সার হেনরি ওয়েটের (Sir Henry Wyatt) ছবিটি ফ্লরেন্সের উফিজি (Uffizi) চিত্রশালার রাখা আছে। তাঁর আঁকা সার রিচার্ড সাউথওয়েলের (Sir Richard Southwell) ছবিটিও বিখ্যাত। রুবেন্স ছিলেন হলবেনের ঠিক পরবর্ত্তী বড় শিল্পী। তাঁর বিষয় প্রবাদ আছে যে, তিনি রাজশিল্পী-রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করার পর ৬০,০০০ ফ্লোরিন মুদ্রা ব্যয় করে একটি সুন্দর অট্টালিকা তৈরী করিয়েছিলেন এবং তার দেয়ালে তিনি নিজে ছবি এঁকেছিলেন। যে জমির উপর বাড়ীটি তৈরী করেছিলেন, সেটি একটি তীরন্দাজ শ্রেণীর কুচক্রী লোকের ছিল। ঐ জমি কেনা

হল্‌বেন
(Holbein)

পেটার পল রুবেন্স
(Peter Paul
Rubens)
১৫৭৭—১৬৪০ খৃঃ

নিয়ে আদালতে ছুটোছুটি করানোর দায় এড়াবার জন্যে তিনি তাকে সাধু ক্রিস্টোফারের (St. Christopher) একটি ছবি এঁকে দিয়ে মামলার রফা করে নিয়েছিলেন। এই চিত্রটি তাঁর মুখ্য চিত্র-হিসাবে জগতে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর বিষয় আরো একটি প্রবাদ আছে। তাঁর শিষ্য ভ্যান-ডাইক (Van Dyck) তাঁর চিত্রাগারে ছবি দেখতে গিয়ে দৈবাৎ তাঁর একটি ছবির অংশ নষ্ট করে ফেলেছিলেন। তিনি গুরুর অসাক্ষাতে (তাঁর আসবার আগেই) তাড়াতাড়ি সেটি মেরামত করে রেখে দিয়েছিলেন। গুরুর সেটি অবিদিত রইল না—তিনি শিষ্যের 'কারচুপি' ধরে ফেল্লেন এবং তাঁকে ডেকে বল্লেন যে মেরামৎ করা অংশটিই তাঁর ছবির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ অংশ হয়ে রইল। রুবেন্স এইভাবে তাঁর শিষ্য ভ্যান ডাইককে উৎসাহিত করে তুলতেন।

রুবেন্সের আঁকা এ্যাণ্টওয়ার্পের (Antwerp) গির্জ্জায় রক্ষিত ক্রুশ থেকে অবতরণ (The Descent of the Cross) চিত্রটি খুবই বিখ্যাত। ইনি প্রতিকৃতি আঁকতেও বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্পেনে সম্রাট চতুর্থ ফিলিপ (Philip IV) ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনার জন্যে শিল্পী রুবেন্সকে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর খুসী হয়ে তাঁকে 'নাইট' (Knight) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রাজ-নৈতিক বুদ্ধি ও চিত্রকলার জ্ঞান সমান তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে ভ্যান ডাইকই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। এঁর আঁকা 'ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্ট' (The Crucifixion) সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের (Emperor Maximillian I) ছবি এবং সিংহ-শিকার (A Lion Hunt) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রুবেন্সের শিষ্য ভ্যান ডাইকের নাম শুনে ইংলণ্ডেশ্বর তাঁকে (স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ-বিবাদের অবসানের পর) নিজের কাছে আহ্বান করেন। সভা-শিল্পী-রূপে অবস্থানকালে সম্রাট তাঁকে 'নাইট' পদবীতে ভূষিত করেন। এ-সময় ভ্যান ডাইক রাজদরবারের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির, রাজপুত্র ও রাজার প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। প্রথম চার্লসের (Charles I) প্রতিকৃতিটি তাঁর একটি বিখ্যাত চিত্রকলা। ছবিখানিতে সম্রাটের আমোদপ্রিয়তার বিশেষ ভাবটি বেশ সুন্দর ফুটে উঠেছে। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট বাৎসরিক ২০০ পাউণ্ড বেতন ও প্রত্যেক কাজের জন্যে ১০০ পাউণ্ড লাভ করতেন। তা'ছাড়া সম্রাট তাঁকে ব্যাক ফ্রায়ারের (Back Friar's House) বাড়ীটিতে এবং এলথ্যাম প্রাসাদে (Eltham Palace) থাকতে দিয়েছিলেন। ভ্যান ডাইক তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রে মানুষের চরিত্রগত বিশেষত্বটি বেশ ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, তিনি যে সময় যাঁর প্রতিকৃতি আঁকতেন, তখন তাঁকে বারবার নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে ভোজ দিতেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তার দ্বারা তাঁর চরিত্রগত রূপটির সন্ধান পাবার চেষ্টা করতেন।

ভ্যান ডাইক
(Van Dyck)

এঁর ঠিক পরবর্ত্তী বিখ্যাত শিল্পী হলেন রামব্র্যান্ত। ইনি ছিলেন 'ডচ্' এবং এমষ্টারডামের (Amsterdam) প্রথায় চিত্র-শিল্প শিখেছিলেন। ২৪ বৎসর বয়সেই একটি বড় বাড়ী ভাড়া করে অনেক শিষ্যদের নিয়ে একটি শিল্প-চক্র গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক পুরুষ। কারো

কোনো প্রতিকূল সমালোচনাকে ভয় করে চলতেন না। তাঁর আঁকা শারীরতথ্য শিক্ষা (Anatomical Lesson), রাতের পাহারা (Night Watch), এলিজাবেথের প্রতিকৃতি (Portrait of Elizabeth), আত্ম-প্রতিকৃতি (Self Portrait), অর্ণবপোত রচয়িতা ও তাঁর পত্নী (The Shipbuilder and his Wife) প্রভৃতি চিত্রগুলি জগদ্বিখ্যাত। জানা যায় শিল্পীর দ্বিতীয় পত্নীর অব্যবস্থার দরুন ১৬৫৪ থেকে ১৬৫৮ পর্য্যন্ত বড়ই অভাবে তাঁকে পড়তে হয়েছিল। তাঁর চিত্র আঁকার সরঞ্জাম এবং মাত্র কয়েকটি চিত্র সম্বল করে ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল।

রামব্রান্ত
(Rambrandt)
১৬০৬-১৬৬৮ খৃঃ

ভেলাসকুইজের ছবিতে রুবেন্সের ছায়াপাত অনেকটা দেখা যায়। ভেলাসকুইজ বয়সে স্পেনের সম্রাট চতুর্থ ফিলিপের (Philips IV) চেয়ে কিছু বড় হলেও তাঁর সৌহার্দ্দে তিনি বদ্ধিত হয়েছিলেন। সেই জন্যই তাঁর ছবিতে এত রাজবংশীয়দের প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ভেলাসকুইজের চিত্রকলায় সম্রাট্ এতদূর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে শিল্পীর চিত্রশালার (Studio) একটি চাবি তাঁর নিজের কাছে রাখতেন এবং যখন ইচ্ছা শিল্পীর নিকট উপস্থিত হতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিত্রকরের কাছে বসে ছবি আঁকা দেখা তাঁর এক প্রকার নেশা হয়েছিল। ভেলাসকুইজও নিজের কাজ এবং সম্রাটকে ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুরই খোঁজ রাখতেন না। তাঁর নিজের প্রতিকৃতিটি, চরখা-কাটিয়ের ছাবিটি (The Spinner), পোপ ইনোসেন্টের

ভেলাসকুইজ
(Velasquez)
১৫৯৯-১৬৬০ খৃঃ

ছবিটি (Pope Innocent), সখী (The Maid of Honor) ক্রুশবিদ্ধ (Crucifixion), সাধু (The Hermits) প্রভৃতি অসংখ্য চিত্রকলা তিনি এঁকে গেছেন।

মধ্যযুগে শিল্পী মুরিলোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অসংখ্য প্রকার বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। কখন কখন তাঁকে পেটের দায়ে রাস্তার ধারে ছবি সাজিয়ে রেখে সস্তায় সেগুলি বিক্রি করে জীবিকা-নির্ব্বাহ করতে হয়েছিল। ভেলাসকুইজের প্রতিপত্তির কথা শুনে স্পেনে (মাদ্রিদ শহরে) তাঁর যাবার খুব ইচ্ছা হয়। খুব লম্বা একটি ক্যাম্বিশের উপর ছোট ছোট অনেকগুলি ছবি তাতে এঁকে কোনো আমেরিকান পরিব্রাজকের নিকট বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই টাকায় তিনি দু বৎসর মাদ্রিদে ভেলাসকুইজের নিকট শিল্প-চর্চ্চা ক'রে আবার দেশে (Sevilleএ) ফিরে এসেছিলেন। তখন তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হলেন এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করায় অনেক কাজ তিনি পেতে লাগলেন। তাঁর আঁকা প্রতিকৃতি-চিত্র উরোপে নানাস্থানের চিত্রাগারে ছড়িয়ে আছে। ইনি সেণ্ট ক্যাথরিনের বিবাহ (Marriage of St. Catherine) সম্বন্ধে একটি বিরাট চিত্র দেয়ালের গায়ে মাচা বেঁধে আঁকছিলেন, দৈবাৎ সেই উঁচু মাচা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। এঁর পরে সে সময় ইটালীতে মধ্যযুগের শিল্পকলার অবনতি হয়েছিল। ফরাসী দেশে তখন দু জন বিচক্ষণ শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল, পুশীন (Poussin) ও লোঁরিন (Lorroine)। বেশীর ভাগ প্রাকৃতিক দৃশ্যই

মুরিলো
(Murillo)
১৬১৭-

তাঁরা আঁকতেন। এঁরাই দৃশ্য-চিত্রের (Landscape-এর) প্রচলন প্রথম করেন।

স্পেনের শিল্পীদের মধ্যে গোয়া খুবই নাম করেছিলেন। স্পেনে তাঁর নকল করেনি এমন শিল্পী পরবর্ত্তী যুগে খুব কমই ছিল। গোয়া একজন সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোকের ছেলে ছিলেন। তাঁর দুর্দ্দিনের সময় ধর্ম্মযাজক 'ফাদার সালসেদোই (Father Salcedo) তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে গোয়া কখনই অত বড় শিল্পী হতে পারতেন না। গোয়ার আরো একটি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন 'সারাগোসার' (Sara Gossa) ফিউয়েনটেসের কাউন্ট (Count of Fuentes)। গোয়া ভীষণ দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদ্দাম যৌবনের বেগে অনেক সময় অনেক অবিবেকী কাজ তিনি করে ফেলতেন। শেষে তাঁকে সেই কারণেই সারাগোসা ত্যাগ করতে হয়েছিল। অবশেষে তাঁকে ঘরবাড়ী ছেড়ে সেই কারণেই রাজধানী মাদ্রিদে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। রাজধানীতে এসে রাজপ্রাসাদের চিত্র-সজ্জার ভার তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু সেখানেও তাঁকে শেষকালে একজন রাজ-পরিষদের সঙ্গে মারপিট করে ছোরার ঘা খেয়ে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। দেশে এসে ঘরবাড়ী বিক্রী করে তিনি কিছুকাল রোমে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। সেখানে তাঁর কাজে সকলেই মুগ্ধ হন এবং তিনি পারমা এ্যাকাডামীর (Acadamy of Parma) বিশেষ পারিতোষকটি লাভ করেন। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় চরিত্রের জন্যে এবং কোনো একটি গর্হিত হঠকারিতার অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ডের

গোয়া (Goya)
১৭৪৬-১৮২৮

আদেশ হয়। কিন্তু স্পেনের কোনো গুণগ্রাহী রাজদূতের অনুরোধে স্পেন-সম্রাট তাঁকে তার নিজের দেশে (সারাগোসায়) বন্দীভাবে রেখেছিলেন। সেখানে তাঁর কোনো একজন পুরাতন বন্ধু তাঁকে কিছু কাজ করতে দেন। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে বিবাহ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবন সুখময় হয়নি। পরে তিনি স্পেনের সম্রাট চতুর্থ চার্লসের (Charles IV) সম্রাজ্ঞীর সুনজরে পড়েছিলেন। সেই সময় তিনি এ্যালবার ডাচেসের (Duchess of Alba) প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। গোয়া তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বেয়ানের (Bayen) প্রতিকৃতি, ডন সাবাস্তিনের (Sebastian) প্রতিকৃতি, প্রভৃতি অসংখ্য চিত্র এঁকেছিলেন। গোয়ার চিত্রে তখনকার রাজনৈতিক অত্যাচারের জীবন্ত ছবির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর একটি ব্যঙ্গ-চিত্রে আছে একটি শব কবর থেকে উঠে কঙ্কাল হস্তে লিখছে "নাদা" (Nada) অর্থাৎ শূন্যতা। তাঁর আঁকা যুদ্ধের সর্ব্বনাশ (Disasters of War), সত্যের মৃত্যু (The Death of Truth) প্রভৃতি চিত্রে যুদ্ধ-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদগুলি উজ্জ্বলভাবে এঁকে রেখে গেছেন। এগুলির মধ্যে তাঁর মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আঁকা 'ষাঁড়ের লড়াই' (A Bull Fight), সম্রাট চতুর্থ চার্লস পরিবার, প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা আছে।

'জেন ভারমিয়ার' ডচ্ শিল্পীদের মধ্যে একজন নামজাদা শিল্পী। তাঁর জীবনের ঘটনার কথা, দুঃখের বিষয়, বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর আঁকা চিকনের কারীগর (The Lace-maker), ছোট্ট পথ (The Little Street) প্রভৃতি চিত্র

জেন ভারমিয়ার (Jan Virmir)

বিখ্যাত। তাঁর আঁকা একটি চিত্র সংগ্রহ করতে আমাষ্টার-দামের মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষদের প্রায় ৭০।৮০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করতে হয়েছিল।

ফরাসী বিদ্রোহের ফলে সম্রাটের প্রাসাদ 'লুভ' (Louvre) ও ভারসাই(Versailles) যখন চিত্রশালায় পরিণত হ'ল, তখন প্রজাতন্ত্রের তরফ থেকে শিল্পী-দের উৎসাহ দেবার জন্যে বাৎসরিক ৪৪২,০০০ ফ্রাঙ্ক পারিতোষিক ধার্য্য করা হয়। 'জ্যাকো লুইস ডেভিড' ঠিক সেই সময়কার শিল্পী ছিলেন। সুতরাং সরকারের তরফ থেকে অনেকবার পারিতোষিক লাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তিনি এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করে তাঁর গুরুর সঙ্গে ইটালীর সকল শিল্প-তীর্থগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। ফরাসীদেশে তখন বিদ্রোহ ও অরাজকতা চলছিল। দেশে ফিরে তিনি রাজ-নৈতিক আন্দোলনে যোগ না দিয়ে নিজের চিত্রকলায় মন দিয়েছিলেন। তারই ফলে তিনি চারুশিল্প সভার (Fine Art Institute) সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ডেভিডের আঁকা নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অনেকগুলি চিত্র আছে। তার মধ্যে আল্‌পস্ পর্ব্বত লঙ্ঘন (Bonaparti Crossing the Alps) ছবিখানিই তাঁকে অমর করে রেখেছে। শুনা যায়, সম্রাট নেপোলিয়ানকে সামনে বসিয়ে তিনি যে প্রতি-কৃতিটি এঁকেছিলেন, সম্রাটের সময়াভাবে সেটি তিনি শেষ করে তুল্‌তে পারেননি। ওয়াটারলুর (Waterloo) যুদ্ধের পর ডেভিডকে বিদ্রোহীর দলের লোক বলে সন্দেহ করায় তাঁকে নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ব্রাসেল্‌সেই

জ্যাকো লুইস ডেভিড (Jacques Louis David) ১৭৪৮—১৮২৫খৃঃ

(Brussels) শেষ জীবন তাঁর কেটেছিল। ডেভিডই সনাতনী (Classical) চিত্রকলার বিশেষত্বটিকে উরোপে পুনরায় প্রচার করেন। তাঁর সনাতনী শিল্পের অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী শিল্পীদের খুবই কাজে লেগেছিল।

ডেভিডের হাতেই মানুষ হয়েছিলেন 'জিনগ্রস'। গ্রসকে ডেভিড সকল প্রকার সাহায্য করেছিলেন। তিনিই তাঁকে ইটালীতে প্রাচীন-শিল্পীদের কাজ দেখবার ও শেখবার জন্যে নিজে খরচ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জেনোয়াতে (Genoa) জোসেফাইন (Josephine) নাম্নী একটি মহিলা (পরে তিনি ফরাসী দেশের সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন) তাঁর কাজ দেখে খুসী হয়ে তাঁকে সম্রাট নেপোলিয়ানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নেপোলিয়ান গ্রসের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর রাজসভায় তাঁকে কাজ দেন। তাঁর আঁকা সম্রাট নেপোলিয়ানের চিত্র লুভের চিত্রশালায় রাখা আছে। নেপোলিয়ানের অপর সকল চিত্রকরদের আঁকা প্রতিকৃতি অপেক্ষা এঁর আঁকা প্রতিকৃতিতে সম্রাটের স্বাভাবিক দৃঢ়তা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার ভাবটি বেশ স্পষ্ট ফুটে আছে। 'গ্রস' ইটালীতে ফরাসী সৈনিকদের সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন। তিনি সে সময় যুদ্ধের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গ্রস তাঁর গুরু ডেভিডের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তার পরিপন্থী হয়ে কাজ করে গিয়েছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ান তাঁকে 'ব্যারণ' (Baron) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের সময় এঁদের মত নাম করা আরো দু জন শিল্পী ছিলেন, গিরোদেঁ (Girode ১৭৬৭—

জিন গ্রস
(Jean Gros)
১৭৭১—১৮৩৫খৃঃ

১৮২৪ খৃঃ) এবং আগাষ্ট ইঙ্গারস্ (August Ingers—১৭৮০ ১৮৬৭ খৃঃ)। শেষোক্তটি ছিলেন ডেভিডের অন্যতম শিষ্য এবং রোমের পারিতোষিক (Prix de Rome) ইনি পেয়েছিলেন। ইঙ্গারের 'আদিমাতা' (La Source) এবং জোয়ান অব আর্কের (Joan of Arc) ছবির বিষয় সকলেই জানেন।

ফরাসী দেশের শিল্পীদের মধ্যে 'করো' প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। করোর আঁকা দৃশ্য-চিত্রগুলি বিশেষত্বমণ্ডিত হওয়ায় তার নকল সহজে কেহই করতে পারতেন না। ইনি আট বৎসর বয়সে সামান্য ফেরিওয়ালার কাজ করে জীবিকা-নির্ব্বাহ করেছিলেন। তাঁর পিতার খুবই অভাবের সংসার ছিল; তাই ২৬ বৎসর বয়স হবার পূর্ব্বে তাঁকে তাঁর পিতা চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। বছরে মাত্র ৬০ পাউণ্ড তাঁর পিতা তাঁর জন্যে ধার্য্য করে দিয়েছিলেন। এই টাকায় তিনি তাঁর ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চিত্রবিদ্যা অনুশীলনে কাটিয়েছিলেন। তাঁর চিত্রের আদর তাঁর জীবিতকালে মোটেই হয়নি। তখন সকলে মানুষের প্রতিকৃতি এবং ধর্ম্ম-বিষয় চিত্রকলার দিকেই বেশী আসক্ত ছিল, দৃশ্যচিত্রের তখনও কদর হয়নি। এঁর মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ মুদ্রায় এঁর ছবি বিক্রি হয়েছিল। শিল্পীদের জীবদ্দশায় এইরূপ দুর্দ্দশার কথা অনেক জানা যায়। উরোপে অশীতিপর বৃদ্ধ শিল্পী 'মনেট' (Monet) এখনো জীবিত আছেন বলে জানা যায়। তাঁর আঁকা ছবি যা' তিনি পূর্ব্বে চার পাউণ্ডে বিক্রি

জিন্ ব্যাপটিস্টে ক্যামেলি করো (Jean Baptiste Camille Corot.) ১৭৯৬—১৮৭৫খৃঃ

করেছিলেন, এখন সেই সব ছবি আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রি করা হচ্চে। করোর দৃশ্যচিত্রগুলি দেখলে মনে হয় প্রকৃতি যেন স্বপ্ন দেখছে। শিল্পীর কবিত্বশক্তি যেন ছবির রঙে ও রেখায় মূর্ত্ত হয়ে আছে।

ইংলণ্ডের চিত্রকর

ইংলণ্ডের সম্রাট অষ্টম হেনরীই (Henry VIII) প্রথমে হলবেনকে নিজের দেশে এনে শিল্পকলার আদর করতে দেশের লোককে শিখিয়েছিলেন। তার পরবর্ত্তী যুগে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ (Queen Elizabeth)) এবং সাম্রাজ্ঞী মেরীর (Queen Mary) সময় ইংলণ্ডে এ্যনটনিও মোরো (Antonio Moro), ভ্যান সোমার (Var Somar) প্রভৃতি উরোপের প্রাদেশিক শিল্পীদের আমদানি হয়েছিল। সম্রাট প্রথম চার্ল'সের (Charles I) সময় পুনরায় শিল্পকলার আদর হয়েছিল। সম্রাট চার্ল'স্ নিজে শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি কেবল শিল্পীদের রাজসভায় নিযুক্ত করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি ইটালী, ডচ্, স্পেন প্রভৃতি দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রকলা ইংলণ্ডের চিত্রাগারের জন্যে সংগ্রহ করতেন। তারই ফলে আজ র‍্যাফেল, লিওনার্দ্দো-দা-ভিনিচি, টিশিয়ান প্রভৃতির চিত্রকলা ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রশালাগুলিতে বিরাজ করছে। এই সময় ভ্যানডাইক ইংলণ্ডের শিল্পকলাকে গৌরবান্বিত করে তুলেছিলেন তার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি।

'সার জোসুয়া রেনল্ডস্' ডেভন সায়ারে (Devon Shire) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর প্রথম শিক্ষা হয় ইটালীতে, তাই তাঁর চিত্রকলার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীদের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। রেনল্ডসের চিত্রাগার (studio) তখনকার লণ্ডনের একটি বিশেষ সম্পদ-স্বরূপ হয়ে

উঠেছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তি নামাই সেখানে যেতেন এবং তাঁকে দিয়ে প্রতিকৃতি আঁকাতেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন

সার জোস্থয়া রেনল্ডস্ (Sir Josua Reynolds) ১৭২৩-১৭৯২ খৃঃ

সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জ (George III) রয়েল এ্যাকাডামীর (Royal Acadamy) প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁকেই প্রথম তার সভাপতি (President) নির্ব্বাচন করেছিলেন এবং তাঁকে নাইট উপাধি দিয়েছিলেন।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে গেন্সবরো জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের শিল্পীদের প্রতিষ্ঠার কারণই এঁর শিল্পকলা। ছেলেবেলা

টমাস গেন্সবরো (Thomas Gainsborough) ১৭২৭—১৭৪৪ খৃঃ

থেকেই এঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। জানা যায় একদিন ছেলেবেলায় খেলার ছলে তাঁদের বাগানে বসে একটি সুপক্ক পিয়ার ফলের ছবি আঁকছিলেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন বাগানের পাঁচিলের ধার থেকে একটি চাষার ছেলে লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই ফলটির দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি ফলটিকে আঁকার সঙ্গে সঙ্গে সেই চাষার ছেলের চেহারাটুকুও চিত্রপটে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর পিতা সেই পটে লেখা চেহারাটি থেকে চাষার ছেলেটিকে চিনতে পেরে তাকে ডাকিয়ে পাঠালেন এবং পর-দ্রব্যে তার লোভের জন্যে ভৎর্সনা করলেন। তাঁর পিতা এইভাবে তাঁর চিত্রকলার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে দশ বৎসর বয়সেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রবিদ্যা শেখবার জন্যে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই তিনি অধ্যবসায়ের গুণে শিল্প-শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর একজন ধনী

বন্ধু তাঁকে সর্ব্বদা ছবি আঁকার কাজের ভার দিয়ে উৎসাহিত করতেন। এইভাবে নানাস্থান থেকে কাজ তাঁর নিকট আসতে আরম্ভ হল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি লণ্ডন শহরে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। গেন্সবরো ছবি আঁকতে যেরূপ দক্ষ ছিলেন, সঙ্গীতে অনুরাগও তাঁর সেইরূপ অসাধারণ ছিল। এ বিষয়ে প্রবাদ আছে, যে-কোনো বিশেষজ্ঞ বাজিয়ের বাদ্যযন্ত্র শোনার পর তিনি সেই বাদ্য-যন্ত্রটি বহু অর্থ ব্যয় করেও সংগ্রহ করতেন এবং তারপর ঠিক সেই বিশেষজ্ঞের মতই তাতে বাজাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছবি আঁকার পর সময় তেমন পেতেন না বিশেষভাবে সঙ্গীত-সাধনা করবার।

গেন্সবরো প্রতিকৃতি-চিত্র এঁকেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর আঁকা ডেভনসায়ারের ডাচেসের (Duchess of Devonshire) ছবি, মিসেস্ রবিন্সন (Mrs Robinson) মিস্ হ্যাভার ফিল্ড (Miss Haverfield) প্রভৃতি ছবিগুলিকে রঙে ও রেখায় তিনি অমর করে রেখে গেছেন। গেন্সবরো নিজের দেশ ছেড়ে ইটালী প্রভৃতি স্থানে চিত্রকলা শিখতে বা দেখতে যান নি; তবে, ইংলণ্ডে নানাস্থানের শিল্পাগারে যে-সকল প্রাচীন চিত্রাবলী রাখা আছে, সেগুলি ভাল করে দেখেছিলেন এবং সে বিষয় অনুশীলন করেছিলেন।

এঁরই সমসাময়িক শিল্পী ছিলেন টার্ণার। টার্ণার মাত্র ২৩ বৎসর বয়সেই রয়েল এ্যাকাডামীর সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

জোসেফ টার্ণার (Joseph Turner) ১৭৭৫—১৮৫১ খৃঃ

প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ইম্প্রেশানিষ্ট স্কুলের (Impressionist School) এঁকে আদি গুরু বলা যেতে পারে। এঁর পূর্ব্বে এই অভিনব বিষয়টির যা চর্চ্চা হয়েছিল, তা' মোটেই উল্লেখযোগ্য

নয়। এঁর চিত্রকলার আর এক প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, এঁর তৈলচিত্রে তেল-চক্‌চকে রঙের বাহুল্য নেই। ইনি ছবির ভিতর বর্ণ-সমাবেশে এক অপূর্ব্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারতেন। তাঁর ছবিগুলিকে ভাল করে বুঝতে না পেরে সমঝদার-মহল (Art-critics) সে সময় সেগুলি অসম্পূর্ণ (unfinished) বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তবুও দেশের লোকের কাছে তাঁর কাজের যে কদর হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় টেটগ্যালারীতে তাঁর চিত্রাবলী স্থান পাওয়ায়। শিল্পী কন্সটবল (Constable) তাঁর চিত্রের বিষয় বলতেন 'সেগুলি সোণার স্বপ্নের মত—কেবল স্বপ্ন হলেও তার সঙ্গে বাস করতে এবং মরতে সকলেই চাইবে।' (They are golden visions, only visions, but still one would like to live and die with such pictures.)

টার্ণারের ছবিগুলি যেন সবই রামধনুকের স্বচ্ছ ও হাল্কা রঙে আঁকা। পরবর্ত্তী শিল্পীরা অনেকে এঁর ছবির অনেক অনুকরণ করলেও তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন নি। তাঁর আঁকা যোদ্ধা টামারাইরা (The Fighting Temeraira) ছবি খানিতে একটি প্রাচীন যুদ্ধের জাহাজকে একটি ছোট্ট ষ্টীমার টেনে নিয়ে যাচ্ছে আঁকা হয়েছে। সেই পুরাতন জীর্ণ জাহাজটিকে 'ডকে' তোলা হচ্ছে ভেঙে ফেলবার জন্য। গোধূলির সন্ধ্যাকাশের ধূসর রঙের ছায়া জলের উপর পড়েছে। ছবিটিতে পূরবী সুরের মত অস্তগামী সূর্য্যের বেদনাটিকে যেন মূর্ত্তি করে দিয়েছেন শিল্পী টার্ণার। রঙের দ্বারা চিত্রকলায় আবহাওয়ার সৃষ্টি করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন প্রথমে টার্ণার।

'ব্লেক' ছিলেন 'মিস্‌টিক' (Mystic) বা আধ্যাত্মিক কবি ও শিল্পী। এঁর চিত্রকলায় কারীগরির কোনোই বাড়াবাড়ি নেই। কল্পনা শক্তির জোরেই এঁর কাজগুলি বিশেষত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। এঁর লেখা 'বুক অব যবের' (Book of Job) চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উইলিয়াম ব্লেক (William Blake) ১৭৫৮—১৮২৭ খৃঃ

'সার টমাস লরেন্স' ছিলেন বোনেদী ঘরের ছেলে, তাঁর চিত্রকলা শিক্ষারও সুযোগ খুব ছিল। ইনি প্রতিকৃতি চিত্র আঁকতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি শেষ বয়েসে রয়েল এ্যাকাডামীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

সার টমাস লরেন্স (Sir Thomas Lawrence.) ১৭৬৯—১৮৩০ খৃঃ

'জর্জ্জ ফ্রেডরিক ওয়াট্‌স' ছিলেন একজন পিয়ানো টিউ-নারের (Piano-tuner) পুত্র। ছেলেবেলায় তিনি হোমারের (Homer) এবং সার ওয়ালটার স্কটের (Sir Walter Scott) কেতাবের জন্যে মনগড়া খামখেয়ালীভাবে কতকগুলি ছবি এঁকেছিলেন; তাঁর সেই প্রথম উদ্যম কতকটা সফলতা মণ্ডিত হয়েছিল। ১৫ বৎসর বয়সেই তিনি তৈলচিত্র আঁকতে আরম্ভ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে তাঁর নিজের প্রতিকৃতি তিনি হুবহু এঁকেছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার জন্য ছবি আঁকার প্রতি-যোগিতায় তিনি ৩০০ পাউণ্ড অর্জ্জন করেন। সেই অর্থ সম্বল করে ইটালীতে শিল্প-শিক্ষার জন্যে গিয়েছিলেন। ওয়াটস্‌ ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে সিদ্ধহস্ত

জর্জ্জ ফ্রেডরিক ওয়াট্‌স (George Fredrick Watts) ১৮১৭—১৯০৪ খৃঃ

ছিলেন। তিনি কবি টেনিসন (Tennyson) ও শিল্পী লিটনের (Leighton) সখ্যতা লাভ করায় তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে ভাব-বিনিময় করার সুযোগ পেতেন। লিটনের নিকট তিনি সঙ্গীত-চর্চ্চারও অনেক সহায়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সকল কলার মধ্যে সঙ্গীতকলাই মানুষের আত্মাকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করতে পারে এবং তার আবেদন পৌঁছায় ঠিক অন্তরের গভীরতম প্রদেশে। তিনি তখনকার সকল সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তখনকার বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস্ এ্যালন টেরিকে (Miss Ellen Terry) তিনি বিবাহ করেছিলেন।

ওয়াটস্ খুব ভ্রমণবিলাসী ছিলেন। মিশর প্রভৃতি নানাস্থান তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। ওয়াটসের শিল্প-চর্চ্চা কেবল চিত্র ও সঙ্গীতেই পর্য্যবসিত ছিল না, তিনি সকল প্রকার চারু ও কারু শিল্পের (Arts and Crafts) অনুরাগী ছিলেন। কিছুকাল সারেতে (Surry) বসবাস কালে গ্রামবাসীদের মধ্যে শ্রমিক শিল্পের (Industrial Art) চর্চ্চা যাতে হয় তার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর আর এক প্রধান গুণ ছিল যে তিনি নিজেকে কখনো প্রচার করার চেষ্টা করেন নি। তাই দেখা যায় ইংলণ্ডেশ্বর তাঁকে দু বার ব্যারণের পদ (Baronetcy) দেবার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং সাধারণ শিল্পীর মত বাকি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ৮৭ বৎসর বয়সে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

সব মানুষের মধ্যে একটা বংশগত শিক্ষা ও সাধনার ছাপ থাকে, কিন্তু কখন কখন তার ব্যতিক্রম হতেও দেখা যায়। লিটনের পিতা এবং পিতামহ ছিলেন চিকিৎসক,

কিন্তু তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল চিত্রকলার উপর। তার পিতা তাঁর শিল্পানুরাগের বিষয় জানতে পেরে তাঁকে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রবিদ্যা-শিক্ষারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এমন কি, তাঁকে ইটালী, জার্ম্মানী প্রভৃতি স্থানে শিল্প-শিক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভাবে পিতার নিকট উৎসাহ লাভ করে এবং নানা দেশ পরিভ্রমণ করার সুযোগ পেয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নানা দেশের শিল্পকে বোঝ-বার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন খুব অল্প বয়সেই। তিনি শেষ জীবনেও এইরূপ দেশ-পর্য্যটন করা ছাড়েন নি এবং দামাস্কাস (Damuscus) মিশর, স্পেন প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই যেতেন।

লিটন
(Leightion)

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। তিনি প্রথমে 'নাইট' (Knight) পরে ব্যারনেট (Baronet) এবং এমন কি 'পিয়ার' (Peer) পর্য্যন্ত হবার সম্মানলাভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, 'পিয়ার' হবার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মুখোজ্জ্বলকারী উরোপীয় শিল্পী ছিলেন। এঁর ভেনিসের পুরনারী (Noble Lady of Venice), সাইকীর স্নান (The Bath of Phyche), গ্রীষ্মের চন্দ্র (Summer Moon) প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রসোটি ছিলেন একজন কাব্য-রসিক শিল্পী। কবি কীট্স (Keats) ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। তাঁর চিত্রকলায় কীট্সের কাব্য-রসের আমেজ পাওয়া যায়। এঁর সঙ্গে আরো দু জন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে—'হলমেন হাণ্ট' (Halman Hunt)

ডি. গাব্রিয়েল
রসেটি
D. Gabrial
Rossetti

এবং 'মিলায়েস' (Millais)। শেষোক্ত শিল্পী সেক্সপীয়ার-বর্ণিত ওফেলিয়ার ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

বার্ণ জোন্‌সের চিত্রকলা বোনেদী ইটালীয় চিত্রকলার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি তারই উপর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন। বার্ণ জোন্‌স অন্যান্য শিল্পীদের মত শিল্পকলার বা শিল্পীদের আবহাওয়ায় মানুষ হন নি। তিনি নিজেই তাঁর প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং বেশী বয়সেই শিল্প-চর্চ্চা আরম্ভ করেছিলেন। ছেলেবেলায় তাঁর লেখাপড়ায় খুবই অনুরাগ ছিল। অক্সফোর্ডে (Oxford) শিক্ষা-কালে শিল্পী ও শিল্প-রসিক বিখ্যাত উইলিয়ম মরিসের (William Morris) সংসর্গে এসে পড়েন। এই উইলিয়াম মরিসই উরোপের কারুশিল্পের (Arts & Crafts) উন্নতির জন্যে দায়ী! বার্ণ জোন্‌স ও মরিস দু জনেই গিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে ধর্ম্মযাযক হবার শিক্ষা ও দীক্ষা নেবার জন্যে, কিন্তু হয়ে পড়লেন তাঁরা দু জনেই ধুরন্ধর শিল্পী। বার্ণ-জোন্‌স সে সময়কার বিখ্যাত শিল্পী রসেটির (Rossetti) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রসেটি বার্ণ-জোন্‌সের শিক্ষার যাবতীয় ভার সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য যাতে কিছু কাজও পান, তারও ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছিলেন। বার্ণ জোনস্ তাঁর গুরুর মারফৎ প্রথম বাইরের কাজ পেয়েছিলেন পাওয়েল (Messrs Powell Glass maker) কোম্পানীর কাচের কাজের জন্যে নক্সাকারীর পরিকল্পনার। পরিকল্পনাটি এত ভাল হয়েছিল যে 'রাসকিনের' (Ruskin) মত সমঝদার নক্সাকারীর কাজটি দেখে পাওরেল কোম্পানীকে

বার্ণ-জোন্‌স
(Burne Jones)

লিখেছিলেন, "আমি কাচের উপর নক্সার কাজের বাহার দেখে শিল্পীর কত দূর যে ক্ষমতা আছে জানতে পেরে আনন্দে অধীর হয়ে গেছি।" পরে তাঁর বন্ধু উইলিয়ম মরিস যখন মরিস মার্শেল ফ্যাঙকার এণ্ড কোম্পানী (Moris' Marshall, Fanker & Co) নাম দিয়ে একটি শিল্প-ব্যবসার প্রতিষ্ঠান খোলেন, তখন বার্ণ-জোন্‌স তাঁর জন্যে রঙিন কাচের (Stained Glass) পর্দ্দা (tapestry) প্রভৃতির জন্যে বিস্তর নক্সা সরবরাহ করতে আরম্ভ করলেন। এই সব কাজ থেকে শিল্পীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কেবল চিত্রকলাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, প্রকৃত শিল্পীর মত সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দিকেই তাঁর মন ছিল। রসেটির নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা-লাভ করলেও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভার ছাপ অসংখ্য চিত্রকলায় তিনি রেখে গেছেন। তাঁর আঁকা কোপেথনা রাজ ও ভিখারী মেয়ে (King Cophetna and the Beggar Maid), নিমুর মোহ (The Enchantment of Niume) প্রভৃতি ছবিগুলি দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে তিনি কাজ করতে কত ভালবাসতেন। তাঁর তুলির টানে যত্ন ও সহিষ্ণুতার পরিচয় খুবই পাওয়া যায়।

হুইসলার
(Whistler)

হুইসলারই প্রথমে লণ্ডন নগরীর শীতকালের বিকট ধোঁয়ায় ভরা নিবিড় অন্ধকারকে স্বচ্ছ ও সুন্দর করে মানুষের নিকট চিত্রপটে পরিবেষণ করে দেন। তারই ফলে তাঁর ছবিতে সহরের কুৎসিৎ লোহার সেতু, কলের চিম্‌নি, প্রভৃতিও প্রকৃতির দুলালে পরিণত হয়ে গেল। হুইস্‌লার ছিলেন সৌখিন সাহিত্য-রসিক লোক। সঙ্গীতেও তাঁর বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল।

তাঁর চিন্তার স্তর ছিল খুবই উন্নত—গতানুগতিকতার ধার তিনি ধারতেন না। এমন কি, তিনি উরোপের শিল্পে জাপানী চিত্রকলার প্রভাব এনেছিলেন বলে জানা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মিলন ঘটানোর দরুন তাঁর চিত্র-কলায় বেশ একটু নতুনত্ব ফুটে উঠেছিল। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে জাপানী প্রভাব বেশ ধরা যায়। এঁর চীন ও জাপানী চিত্র ও বাসন প্রভৃতি সংগ্রহ করারও সখ ছিল। সর্ব্বদা তিনি এই সব প্রাচ্য জিনিষের আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন। এইভাবে দেশ-বিদেশের শিল্পকলার আদান-প্রদান হওয়ায় দেশের সঙ্গে বিদেশের সহানুভূতির উদয় হয় এবং সৌহার্দ্দ-স্থাপনা কতকটা সম্ভব হতে পারে। এখনকার কালে দেখা যায় উরোপে জাপানী ধরণের অতি আধুনিক আসবাব পত্রের প্রচলন হয়েছে।

হুইসলারের জন্ম হয়েছিল আমেরিকায়। কিন্তু ২০ বৎসর বয়সের পর তিনি আর তাঁর জন্মস্থানে বাস করতে পারেন নি। কিছুকাল প্যারিসে চিত্রকলা-শিক্ষার পর লণ্ডনে এসেই বসবাস করেন। হুইসলারের বিষয় প্রবাদ আছে যে, তাঁর ছবি বিক্রি হয়ে যাবার পর ছবিখানি ক্রেতার নিকট চলে গেলে তিনি বৎসহারা গাভীর মত বেদনা অনুভব করতেন। সুযোগ পেলে ক্রেতার নিকট গিয়ে কিছুদিনের জন্যে তাঁর ছবি ফিরিয়ে আনতেন এবং কখন-কখন পুনরায় ফিরিয়ে দিতে ভুলেও যেতেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর এইরূপ অনেকগুলি চিত্র পাওয়া গিয়েছিল তাঁর চিত্রশালায়। লণ্ডনে অবস্থান কালে তাঁর সমসাময়িক শিল্পী রসেটির সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর চিত্রকলা সুইনবার্ণের (Swinburne)

মত বড় কবিকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি তাঁর একটি চিত্রকে উপলক্ষ্য করে সরস কবিতা রচনা করেছিলেন।

হুইস্‌লারের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা হ'ল রাসকিনের উপর মানহানির মামলা চালানো। কেনো প্রদর্শনাতে তিনি তাঁর একটি ছবির দাম ধার্য্য করেছিলেন ২০০ গিনি; শিল্পরসিক রাসকিনের মতে ছবিখানির দাম অতবেশী হতে পারে না, কেন-না ছবিটি যেন কেবল' রঙের পাত্র সর্ব্ব-সাধারণের মুখের উপর ছুঁড়ে মারা' ছাড়া আর কিছুই নয় (Flinging a pot of paint in the public's face)। ছবিখানি আঁকতে মাত্র দুদিন লেগেছিল এবং তিনি তার দাম ২০০ গিনি চান দেখে বিচারক বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি বলেছিলে যে তাঁর খাটুনির দাম হিসাবে তার দাম নয়, তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফলে আজ তিনি এই ছবিটি আঁকতে পেরেচেন বলেই তার এত বেশী দাম তিনি চেয়েছেন। হুইসলার মামলায় জিতে গেলেন এবং মাত্র এক ফার্দ্দিং জরিমানাস্বরূপ রাসকিনের নিকট মানহানির দাবী আদায় করলেন। কিন্তু এই মামলার ফলে শিল্পীর সমূহ আর্থিক ক্ষতি হ'ল। কেন-না, তখন সর্ব্বসাধারণের জন্যে শিল্পকলার ভালমন্দর যাচাই রাসকিনই করতেন এবং তাঁরই কথামত বড়লোকেরা শিল্পীদের কাছথেকে ছবি কিনতেন। তারই ফলে ২০ বৎসর যাবৎ আর তিনি ছবি বিক্রি করতে পারলেন না। এই মামলা শেষ হবার পর তিনি এক বৎসর ইটালীতে অজ্ঞাত বাস করেছিলেন। তাঁর সেই সময়কার ইটালীর নানা স্থানের প্যাসটেলের (Pastel) আঁকা ছবি এখনো দেখতে পাওয়া যায়। তিনি চিত্রকলার বিষয় কতকগুলি সারগর্ভ

বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। তাঁর আঁকা কার্লাইলোর (Carlyle) প্রতিকৃতি, প্রাচীন ব্যাট্রাসিয়ার সেতু (Old Battersea Bridge), খালের মধ্যে (In the Cannal), রাত্রের নীল এবং রৌপ্য (Nocturne Blue & Silver) প্রভৃতি চিত্র বিখ্যাত। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

সার্জ্জেণ্ট
(Sargent)
১৮৫৬—

'সার্জ্জেণ্ট' ছিলেন প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের জন্যে প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রগুলির মধ্যে মানুষের মুখের খুঁটিনাটির ভাব কিছুই বাদ পড়তো না। শিল্পী ভ্যানডাইকের মত তিনি যাঁর ছবি আঁকতেন তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতেন। এইভাবে মানুষটির প্রকৃতিটি বেশ বুঝে নিয়ে তবে তার ছবিতে হাত দিতেন। সার্জ্জেণ্টের ছবিতে বর্ণ-সমাবেশেরও খুবই বিশেষত্ব আছে। তিনি বর্ণ-ছন্দের (Colour harmony) উপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন। কোনো ছবিটিতে হয়ত কেবল খয়রী ও সোনালী, কোনোটিতে ধূসর ও গেলাপী এইভাবে রঙের সামঞ্জস্যের বিষয় ভেবে নিয়ে তবে ছবি আঁকতেন। বিখ্যাত অভিনেতৃ এ্যালেনটেরীর প্রতিকৃতি চিত্রটি তিনি সবুজ ও সোনালীর সমাবেশে এঁকেছিলেন। হুইসলারের মত সার্জ্জেণ্টের পিতামাতাও আমেরিকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে প্যারিসে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। ক্রমশ সেখানে চিত্রাঙ্কনে প্রতিষ্ঠালাভ করায় প্যারিস ত্যাগ করে লণ্ডনে এসে বসবাস করেন। লণ্ডনে বাসকালে তিনি শিল্প-জগতে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন এবং তাঁর গৌরব ইংলণ্ডে চিরকাল থাকবে।

ল্যাণ্ডসিয়ার ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একজন অতিপ্রিয় শিল্পী। এঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি এবং এঁর দাদা ছিলেন একজন এনগ্রেভার (Engraver)। সুতরাং শিল্পকলা শেখবার পক্ষে তাঁর সুযোগ যথেষ্ট ছিল। তিনি ১৪ বৎসর বয়সে এ্যাকাডামীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জন্তুজানোয়ার আঁকার দিকেই বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর প্রথম চিত্র যা' চিত্র প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল সেটি একটি ঘোড়ার ছবি। এ্যাকাডামীতে শেখবার সময় তিনি জন্তুর শবচ্ছেদ করে তাদের শারীরতথ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলেন। এথেকে বোঝা যায় তখনকার কালে শিল্পে বাস্তবভাব ফোটাবার দিকে শিল্পীরা কতদূর লক্ষ্য রাখতেন এবং তার সফলতার জন্যে কতটা কষ্ট স্বীকার করতেন। ল্যাণ্ডসিয়ার একজন বিখ্যাত শিকারীও ছিলেন। অনেক সময় বন্দুক ফেলে রেখে জন্তুর ছবি এঁকে নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরিতেন। এঁর সমকক্ষ জন্তু আঁকিয়ে ওস্তাদ শিল্পী উরোপে আর কখনো জন্মান নি। তাঁর আঁকা 'উৎপাতা সিংহ' (A prowling Lion), বেড়ালের থাবা (The Cat's Pow), গাম্ভীর্য্য ও ঔদ্ধত্য (Dignity and Impudence) প্রভৃতি জন্তুর ছবিগুলির কথা সকলেই জানেন। ল্যাণ্ডসিয়ার রয়েল এ্যাকাডামীর সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শেষ বয়েসে দুর্ভাগ্যবশত (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে) একটি রেল দুর্ঘটনায় আহত হ'য়ে স্মৃতিশক্তি-বিলুপ্ত-অবস্থায় কিছুকাল

সার এডউইন ল্যাণ্ডসিয়ার (Sir Edwin Landseer) ১৮০২—১৮৭৩ খৃঃ

বেঁচে থেকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের শিল্পীদের মধ্যে সার লরেন্স আলমা টাডমা (Sir Lawrence Alma Tadma) (১৮৩৬—) লর্ড লিটন (Lord Lytton —১৮৩৬—১৯১৯) সার এডওয়ার্ড পয়েন্টার (Sir Edward J. Pointer—১৮৪১—১৮৯৩), এ্যালবার্ট মুর (Albert Moor) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা বেশীরভাগ ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চিত্রই এঁকে গেছেন। এঁদের ছবিগুলি দেশকে জাতীয় জাগরণে অনুপ্রাণনা যুগিয়ে এসেছে। এ্যালবার্ট মুরের বিশেষ ঝোঁক ছিল মণ্ডন-চিত্রের (Decorative Art) দিকে। তাঁর ছবিগুলি দেখলেই বেশ বোঝা যায় রেখা ও রঙের সাজে ছবিকে সাজিয়ে তুলতে তিনি কত আনন্দ পেতেন। ল্যাভারী (Lavery), সার্জ্জেণ্ট (Sargent), ওয়াট (Watt) হেরকুমার (Herkomer) জর্জ্জ-হেনরী (George Henry) প্রভৃতি ছিলেন প্রতিকৃতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। লণ্ডনে টেটগ্যালারী ও ন্যাশানাল গ্যালারীতে এঁদের অনেক ছবি রাখা আছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় অনেক বড় বড় শিল্পী জন্মেছিলেন। কেন-না, সে সময় ছিল সুদীর্ঘ শান্তির যুগ। যুদ্ধ বিগ্রহ খুবই কম হয়েছিল। তখনকার শিল্পীদের মধ্যে কোটম্যান (Cotman) ও ডেভিড কক্সের (Devid Cox) নাম করা উচিত। এ যুগের বেশীর ভগে শিল্পীরা ছবির মধ্যে দিয়ে কার্য্য-বর্ণিত ঘটনাবলীর দৃশ্য বা ভাবই বেশী ফোটাবার চেষ্টা করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়াটসের "জীবন ও ভালবাসা" (Love

& Life) এ্যালমাটাডমার "ভালবাসা ও কুঁড়েমী" (Love in Idleness) প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাস্তবপন্থী আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে ভাব ও বৈশিষ্ট যাঁরা বজায় রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আমেরিকায় এখন নিকোলাস রোরিক (Nicolas Rocrich), ইংলণ্ডে ফ্রাঙ্কব্রাঙ্‌উইন (Frank Branguin), আগাষ্টাস জন (Augustus John) উইলিয়ম অরপেন, (William Orpen) সার উইলিয়ম রদেন-ষ্টাইন (Sir William Rothenstin), মুরহেড বোন্‌স (Murhead Bones), এ, ডি, লাজলো (A. de Lalzo), এ্যালবার্ট বেস্‌নার্ড (Albert Besnard), জর্জ্জ ক্লসেন (George Closen), রাস্‌ল ফ্লিন্ট (Russel W. Flint), ইগ্‌নাসিও জুলুয়াগা (Ignacio Zuloaga) প্রভৃতি কতকগুলি বড় শিল্পীর নাম করা যায়।

ইউরোপের অভিনব চিত্র-শিল্প

উরোপের অভিনব চিত্র-শিল্পের ধারার মধ্যে ইম্প্রেশনিজ্‌ম (Impressionism), কিউবিজম (Cubism), ফিউচারিজ্‌ম (Futurism), সাররিয়ালিজ্‌ম্ (Surrealism) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। বাস্তব-শিল্পের ধারার একাধিপত্য এতকাল ধরে যেমন চলেছিল তেমনি আবার 'গাস্‌টেভ করবেঁ' (Gustove Courbet, ১৮১৯—১৮৭৭) ছোপ-ছাপভাবে ইম্প্রেসিনিয়ম্ ছবি আঁকার সূত্রপাত করেছিলেন। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের সময় ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে যোগ দিতে হয়েছিল এবং তার ফলে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি শেষে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং বিদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। এঁর সমসাময়িক শিল্পী ছিলেন মিলে (J. F. Millet) তিনিও সে সময় খুব নাম করেছিলেন ইম্প্রোশিনিষ্টভাবে ছবি এঁকে। আবার 'মিলে'র চেয়েও অধিক নাম করেছিলেন 'মনে' (Manet)। ইনি প্যারিসে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'করবেঁর' শিষ্য ছিলেন এবং তাঁরই মত আইন অধ্যয়ন ছেড়ে দিয়ে শিল্প-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এঁর ইম্প্রেশিনিজ্‌মের মধ্যে একটা সমষ্টিগত সামঞ্জস্যের ভাবই থাকত, কোনো জিনিষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি দেখাতেন না। এক নজরে কতকগুলি জিনিষ হঠাৎ দেখলে যেরূপ রঙ ও

রেখার একটি ভাব মনে উদয় হয় এঁর ছবিতেও তাহাই দেখাবার চেষ্টা তিনি করতেন। এঁরাই প্রি-র‍্যাফেলাইট (Pre-Raphaelite) এবং রোমানটিক (Romantic) শিল্পের ধারাকে অভিনব রাস্তায় ফেরাবার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে সনাতনী ও অভিনব দুটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হল উরোপের চিত্রকলায়। 'দেলেরোঁ' (Delaeroix) 'শেভরেল' (Chevreuil) প্রভৃতি অনেকে কেবল রঙের দ্বারা ছবি আঁকার নানা প্রকার পরীক্ষা করেছিলেন। ছবিতে কেবল রঙের দ্বারা আবহাওয়ার সৃষ্টি করা, রঙের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান (Local colour) এবং কোন্‌টিতে রঞ্জনের ভাব (Illumination colour) আছে প্রভৃতি বিষয় অনেক গবেষণা করেছিলেন। ইম্প্রেশিনিষ্টেরা রঙের গভীরতারই (Tone-value) মূল্য দেন। রঙকেও কখন কখন সমষ্টিভাবে পরিবেশন তাঁরা করেন। এইভাবে আঁকাকে কেহ কেহ ডিভিসানিজ্‌ম (Divisionsim) বলেন। এইরূপ ইম্প্রেশানিজ্‌মের উদ্ভাবনা কোনো-একটি ব্যক্তিগত শিল্পীর দ্বারা হয়নি। এই প্রণালীতে এঁকে নাম করেছেন 'ক্যামেলি' (Camille) পিসারো (Pissarro) ক্লড মনেট (Claude Monet) এবং রেঁনো (Renoir)। 'রেনো' ছিলেন দর্জ্জির ছেলে এবং অল্প বয়স থেকেই ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। অল্প বয়সে পোরসিলিনের (Porcelain) উপর ছবি এঁকে পয়সা রোজগার করতেন। তাঁর আঁকা ছবিতে তাই মণ্ডনচিত্রের ভাব পাওয়া যায়।

পোষ্ট ইম্প্রেশানিজ্‌ম (Post-Impressonism) কিউবিজম (Cubism) এবং ফিউচারিজমের (Futurism) ধারার প্রবর্ত্তন হল দুটি প্রধান কারণে। প্রথমতঃ এগুলির আবির্ভাবের

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বেকার প্রচলিত বাস্তব ও রোমান্টিক শিল্পের গতানুগতিকতা দূর হয়ে গেল; তা'ছাড়া ক্রমশ ফটোগ্রাফীর উন্নতি হওয়ায় বাস্তব-শিল্পের নেশা সমাজ থেকে প্রায় একেবারে কেটে গেল। উরোপ তাই তখন তার বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে চিত্র-শিল্পে নানান পরীক্ষা নানাভাবে করতে আরম্ভ করে দিলে। 'পল সেজা' থেকে (Paul Cezanne—১৮:৯ —১৯০৬) আরম্ভ করে 'ভ্যানগফ' (Van Gough ১৮৫৩—১৮৯০) 'গোঁগা' (Gangaui) 'মটিসে' (Matisse) এবং পিকাসো (Picasso) পর্য্যন্ত চল্‌ল এই বিশেষ ধারা। এঁদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একমাত্র গাসটেভ করবেঁ (Gustove Courbet) এবং অনরি দোঁমেয়ার (Honore Duamier) এর সূত্রপাত্র করে গিয়েছিলেন। সোজাসুজিভাবে এই অভিনব পন্থায় ছবি আঁকা এঁরা চালিয়ে গিয়েছেন চলিত রীতিকে উপেক্ষা করে। এই অভিনব উপায়ে নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতার উন্মেষ করবার পন্থা তাঁরা দেখিয়ে গেছেন—কতকটা বিদ্রোহীর মত। 'দোঁমেয়ার' ছিলেন খুবই সাধাসিধা মানুষ এবং খুবই দীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। তাঁর পিতার দরুণ প্রভুর বিষয়-সম্পত্তি লাভ করেও তাঁর সাধাসিধা ভাবটি তিনি বজায় রেখে গেছেন। তাঁর জীবনের এই সহজ ভাবটির পরিচয় তাঁর কাজের মধ্যেও বেশ পাওয়া যায়।

এঁরই মত সেঁজাও একজন নামজাদা অভিনবপন্থীর শিল্পী। সেঁজা কখন জীবিকা-অর্জ্জনের জন্যে ছবি আঁকেন নি। যখন যা তাঁর মনে আসত তাই তিনি আঁকতেন। সেঁজার সমসাময়িক বিখ্যাত শিল্পী ভ্যানগফও খুব ক্ষমতাশালী শিল্পী ছিলেন। এঁর জীবন অনেক বিপদ-

আপদের ওঠা-পড়ার মধ্যে কেটেছিল। ইনি প্রথমে একটি সামান্য চিত্র ব্যবসায়ীর নিকট চাকরী করতেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীনতার স্পৃহা ও ঔদ্ধত্যের জন্যে সে চাকরীটি হারিয়েছিলেন। পরে ইংলণ্ডে গিয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তারপর সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এ্যামষ্টার্ডামে (Amsterdam) ধর্ম্মযাজকেরও কাজ তিনি করেছিলেন। সেখানে ধর্ম্মযাজকদের শিক্ষা-নীতির কঠোরতার মধ্যে তাঁর জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখন তিনি সেখান থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে বেলজিয়ামে ধর্ম্ম-প্রচার করতে গিয়েছিলেন। সেখানে অর্থ-কষ্টে নিপীড়িত অবস্থায় পুনরায় প্যারিসে ফিরে আসেন। সেখানে এসে যখন তুলি ধরলেন, তাতেই তাঁকে অমর করে দিলে। তাঁর হাতে রঙের খেলা এত জীবন্ত রূপ পেতো যে চিত্রপটের উপর তাঁর তুলির আঁচড়গুলি যেন জীবন্ত সাপের মত ফণা তুলে আছে বলে মনে হ'তো। এঁর চিত্রকলার যে বিশেষত্বটি পাওয়া যায়, অন্য শিল্পীদের চিত্রে তা' বিরল।

এঁদের মত 'পল গোঁগা' (Paul Gauguin, ১৮৪৮—১৯০৩) ছিলেন একজন ধুরন্ধর অভিনবপন্থী শিল্পী। ইনি প্রথমে 'ক্যামেলি' ও 'পিসারোর' নিকট ছবি আঁকা শিখেছিলেন। দেশ ভ্রমণের নেশা এঁকে পেয়ে বসেছিল ছেলাবেলা থেকেই এবং পৃথিবীর নানা স্থানে ইনি ঘুরে বেড়াতেন। ৩০ বৎসর বয়সে যখন ব্যবসা-সূত্রে প্যারিসে বাস করছিলেন তখন হঠাৎ একটি দোকানের জানালায় তাঁর গুরু পিসারোর ছবির পরিচয় তিনি প্রথমে পান এবং তারই ফলে তিনি তাঁর নিকট চিত্রকলায় দীক্ষা নেন। তিন বৎসর মাত্র শেখার পর তাঁর

চিত্রকলা ভিন্ন ভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীতে স্থান পায় এবং সেই থেকেই ছবি-আঁকাকে জীবনের ব্রত করেন। গোঁগা ক্রমশ নবধারা (Neo-Impressonism) কাটিয়ে উঠ্‌লেন এবং তাঁর চিত্রকলায় আদিম অসভ্যদের শিল্পের সরলতা স্থান পেতে লাগল। জানা যায়, গোঁগা তাহিতিতে (Tahiti) গিয়েছিলন আদিম অসভ্যদের ছবি আঁকার জন্যে। ইনিই প্রথমে আদিম (Primitive) জাতির সঙ্গীত ও শিল্পের সৌন্দর্য্যের বিষয় সভ্যজগতের গোচর করেন। হুইসলার এনেছিলেন উরোপে চীন ও জাপানের (প্রাচ্যশিল্পের) ঢেউ আর ইনি আনলেন আদিম অসভ্যজাতির রূপকলার বৈচিত্র্যসম্ভার। অসভ্যদের প্রতি তাঁর এই বিশেষ প্রীতির কারণের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন—"তোমার সভ্যতা, তোমার ব্যাধিস্বরূপ এবং আমার অসভ্যতা আমার স্বাস্থ্য যোগায় এই কথাটি মাত্র জেনে রেখো।" জীবিতকালে তাঁর চিত্রকলার কোনোই আদর হয় নি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তিনি দেশের লোকের নিকট পূজা পান।

খুব অল্প সংখ্যক রেখা ও খুব কম রঙে ছ বতে ভাব দেবার পরীক্ষা করেছিলেন হেনরী মেটিসি (Henry Mattisse) এঁর রেখাঙ্কন ক্ষমতা সকল শিল্প-রসিককেই মুগ্ধ করে। ইনি গোড়ায় প্রাচীন ও আধুনিক সকল প্রকার শিল্প-সাধনা শেষ করেছিলেন। অবশেষে তিনি কিছুতেই সন্তোষ-লাভ না করায় নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলেন নানাপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা। ছবি-আঁকার এইরূপ পরীক্ষা করে তাঁর ছবিতে রেখা ও রঙের সকল কথা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করলেন, ফলের

আশা না রেখে। এঁর চিত্রে ব্যায়জান্টাইন শিল্পের ভাব যেন এক নবরূপে নব-ধারায় ইনি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন বলে মনে হয়।

এই সময় অভ্যুদয় হ'ল পিকাসোর (Picasso)। ইনি অতি আধুনিক (Surrealist) শিল্পীদের অগ্রণী। ইনিই প্রথমে কিউবিজয়মের (Cubism) আমদানী করেছিলেন। ইনি একজন বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন শিল্পী। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন সকল বস্তুরই আদিম চেহারা হল 'কৃষ্টাল' (Crystal) এবং তা' থেকেই সকল জিনিষই আকার পেয়েছে বিভিন্নরূপে। অতএব শিল্পী সত্যের সন্ধান যা তাঁর বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে পেলেন সেইটিই প্রচার করলেন তাঁর 'কিউবিষ্ট' চিত্রকলায়। তাই মানুষের আকার, ঘর, বাড়ী, সব জিনিষই আঁকতে হ'ল তাঁকে 'পরকলার' (Cube) আকারে গেঁথে। তা'ছাড়া পরকলা আঁকার দরুণ জিনিষের তিন দিকের আয়তনও (Three dimensions) চিত্রে দেখানো সম্ভব হল। চিত্রে জিনিষের উচ্চতা, পরিধি ও গভীরতা ফোটানো সহজ হয়ে গেল। এইভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী বাস্তবপন্থীর পর এক জটিল-শিল্পের আমদানী এঁরা করলেন, যা' সাধারণের দুর্ব্বোধ্য।

গত মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলারও এক যুগপরিবর্ত্তন উরোপে দেখা দিয়েছে। শিল্পকলা মানুষের মনকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্বেগের মধ্যে শান্তি দিয়েছে। যে-সব ব্যক্তি জীবনে কখনো চিত্র বা সঙ্গীতকলার দিকে ফিরেও দেখেননি এই মহাযুদ্ধে তাঁরাও বারবার চিত্র ও সঙ্গীতের রস উপভোগ করে যুদ্ধের বীভৎস স্মৃতিকে ভোলবার চেষ্টা করেছেন। এই

যুদ্ধের পর মানুষ এ-কথা বেশ বুঝতে পারলে যে এক জাতিকে অপর জাতি মেনে নিতে পারে এবং বুঝতে পারে একমাত্র শিল্পকলার ভিতর দিয়ে। তাই দেখা যায় 'সাররিয়ালিজম', (Surrealism) 'দাদাইজম' (Dadaism) সবই সহজে চলে গেল পরীক্ষা-হিসাবে উরোপের শিল্প-জগতে। সকলপ্রকার শিল্প-পরীক্ষাকেই উরোপ প্রশ্রয় দিয়েছে, উপেক্ষা করে নি।

অতি আধুনিক শিল্প-চর্চ্চার অরো একটি কারণ হ'ল উরোপীয়দের ব্যবসা-বুদ্ধি (Commercial enterprise)। এখন চাই নূতন নূতন মণ্ডন-শিল্প কার্পেটের উপর, আসবাব-পত্রের মধ্যে। এই অভিনব চিত্রকলায় যে-সব চিত্র-বিচিত্র নক্সা গড়ে উঠছে, সেগুলি কারুশিল্পের কারীগরীর সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যে কাজে লাগছে। তাই দেখা যায়, জার্ম্মানীতে 'পেশস্টাইন', 'লোরোসাঁ', 'কান্‌ডান্‌স্কী.' 'কুবীন' 'ফাইনিঙগার' প্রভৃতি অতি আধুনিক চিত্রেব নক্সাগুলি পণ্যদ্রব্যসম্ভারের মধ্যে খুব চলে যাচ্চে। জানি না, উরোপের মহিলাদের চির-পরিবর্ত্তনশীল পোষাকের ফ্যাসানের মত এই অতি আধুনিক শিল্প শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! চিত্র-শিল্পে অতি আধুনিকতার ঢেউ প্রথমে ফরাসী শিল্পীরাই আনেন এবং ক্রমশ প্রায় সমগ্র উরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই আধুনিকতার মধ্যে আছে—শিল্প ও বিজ্ঞানের খেলা; তা'ছাড়া চল্‌তি বাস্তব-শিল্পের গতানুগতিকতার উপর বীতরাগ এবং নূতন একটা-কিছু করার দিকে মানুষের স্বাভাবিক স্পৃহা। আধুনিক কালে যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করা সহজ হওয়ায় মানুষের মনের ভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে।

সম্প্রতি রয়েল সোসাইটি অব আর্টসের (Royal Society of Arts) রাইট অনারেবল ভাইকাউন্ট আল্‌স্‌ওয়াটারের (Right Hon. Viscount Ullswater P. C. G. C. B) সভাপতিত্বে বিখ্যাত প্রতিকৃতি-চিত্রকর ফিলিপ-দা-ল্যাজলো (Philip A. de Laszlo M. V. O) মহাশয় একটি বক্তৃতা করেন; তাতে তিনি সম-সাময়িক শিল্পের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। তিনি আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে উরোপের পূর্ব্বেকার চিত্রকলার তুলনা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন—আধুনিক শিল্পীরা ঠিক কোন্ পথে যাচ্ছেন। তিনি বলেছিলেন ঃ বস্তুতন্ত্র-যুগে আমরা বাস করছি—আমরা (আধুনিকেরা) এক অসীম অস্থৈর্য্যের মধ্যে আছি—এক দণ্ডও বসে ভাববার সময় নেই আমাদের। এখন চাই একটি নাড়া-চাড়া (Sensation);—জীবনের সব-কিছুরই মধ্যে অব্যবস্থা কুৎসিত ভাব দেখা দিয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে এই সব আধুনিক চিত্রকরদের চেয়ে আদিম প্রস্তর যুগের মানুষদের গুহা-গহ্বরের গায়ে আঁকা প্রাগ্-ঐতিহাসিক চিত্রাবলীতে আন্তরিকতা আছে; অতি আধুনিকের চিত্রে সেরূপ আন্তরিকতা নেই। আদিম মানুষ প্রকৃতির মধ্যে যা' দেখেছে, তাই মন থেকে আঁকবার চেষ্টা করেছে। তারা অবহেলার ভরে আঁকে নি—এঁকেছে বেশ যত্ন করেই। আর আধুনিক শিল্পে মানুষের আকারকে (তাঁর মতে) বিকারে পরিণত করে এবং প্রকৃতিকে দুঃস্বপ্নের মত পরিকল্পনা করে কেবল যথেচ্ছাচারিতাই আনা হয়েছে চিত্রকলায়। তাঁর মতে প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দিয়ে চিত্রকলা কখনো গড়ে উঠতে পারে না। প্রকৃতিকে কোনো একটি আলঙ্কারিক রূপ

দিতে তাঁর কোনোই আপত্তি নেই। তিনি বলেন যে কোনো জাতির জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে শিল্পের স্থান খুবই উঁচুতে এবং তার ধারা ঠিক পথে চালানোই বাঞ্ছনীয়।*

* The Journal of the Royal Socity of Arts, August 7, 1936

শব্দ-সূচী

অ

আ

ই

উ

এ

খ

গ

ট

ড

ত

থ

দ

ন

প

ফ

ল

শ

স

রোমান ছাদের খিলান

বাইজান্তাইন খিলান

রোমানাস্ক খিলান

রোমান খিলান

গথিক ছাদ ও খিলান

মিসর ছাদ
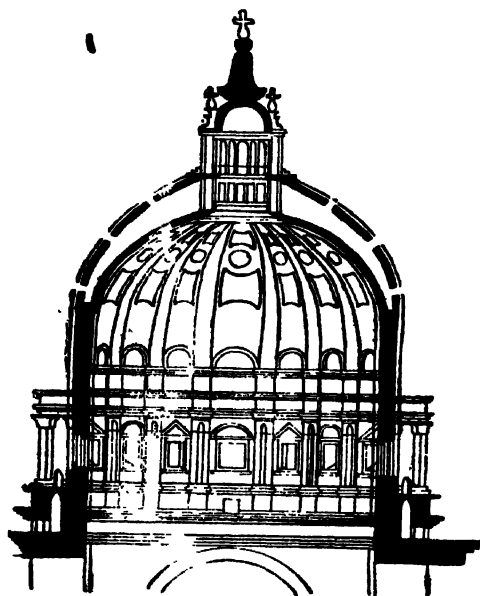
রেনেসাঁ যুগের ছাদের খিলান
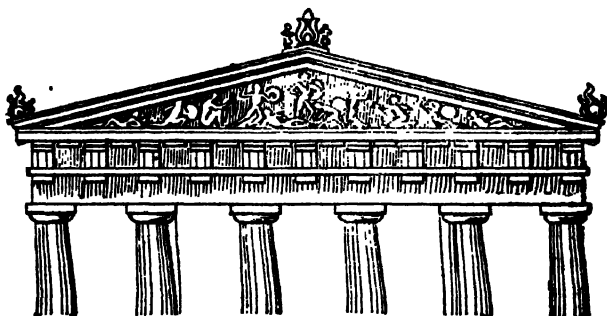
গ্রীক ছাদ
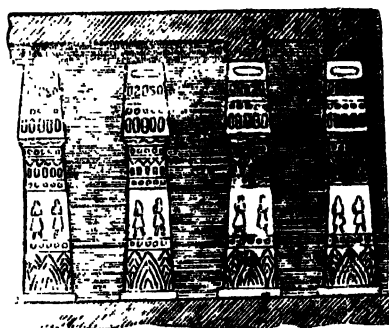
মিসরের খিলান

করিন্থিয়ান স্তম্ভ-কলস
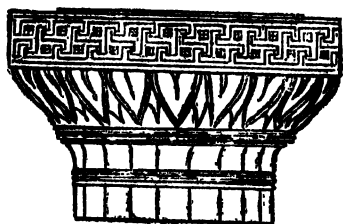
গ্রীক স্তম্ভ-কলস

করিন্থিয়ান স্তম্ভ-কলস
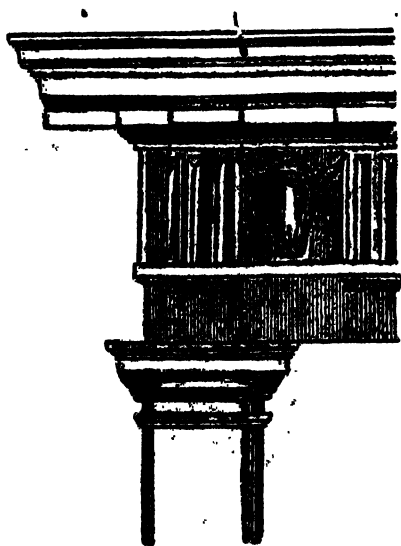
রোমান ডোরিক স্তম্ভ
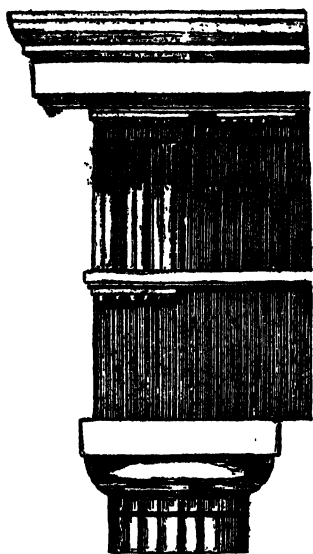
গ্রীক ডোরিক
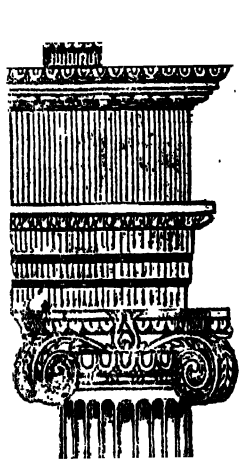
রোমান আইওনিক স্তম্ভ-কলস

গ্রীক আইওনিক স্তম্ভ-কলস